বার্ষিকী-২০২১

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

www.drmc.edu.bd

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ জামাল

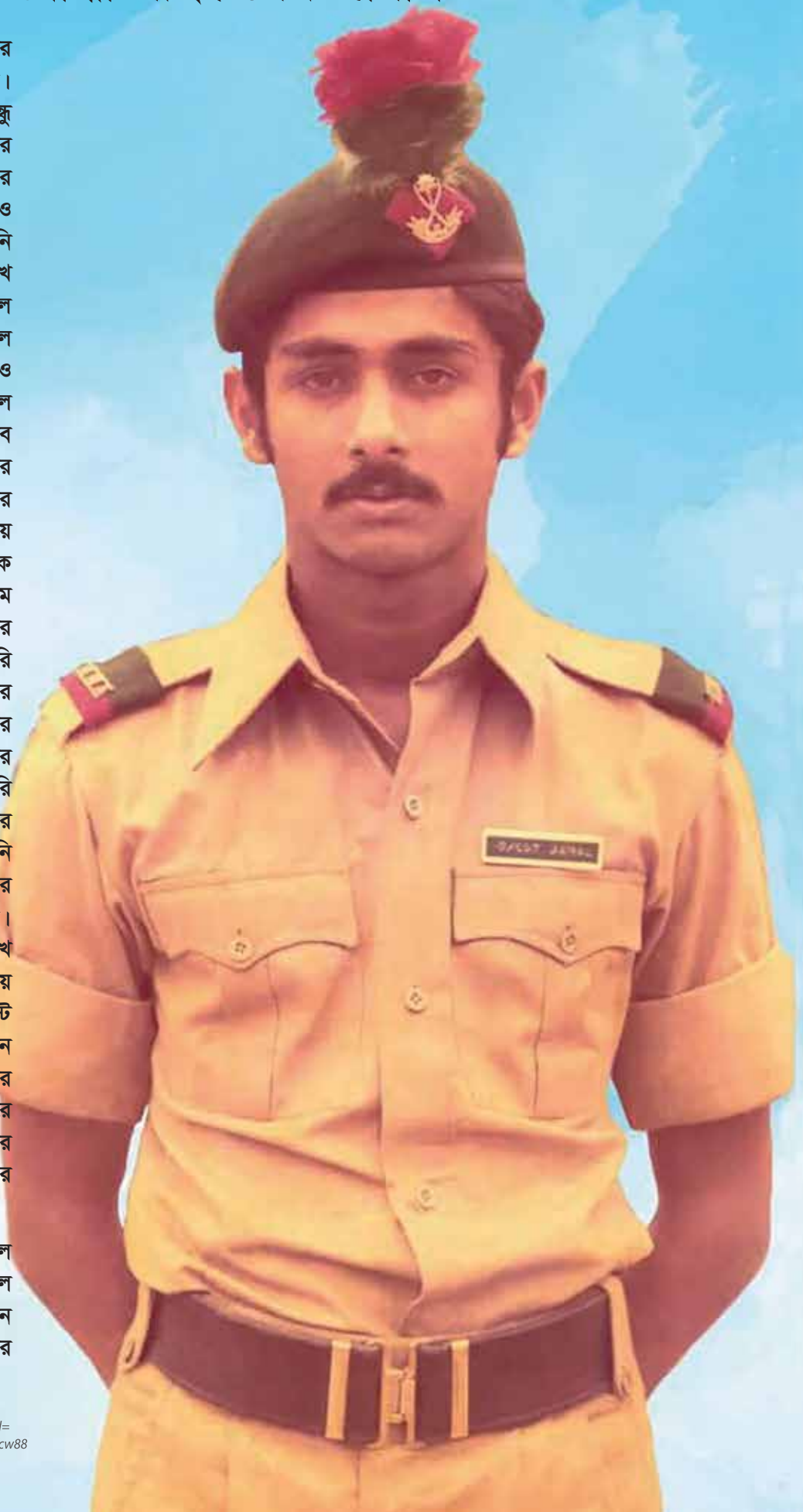

অত্যন্ত মেধাবী, স্বল্পভাষী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের জন্ম ১৯৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া ও খেলাধুলার প্রতি অনেক আগ্রহী ছিলেন। তিনি ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। শেখ জামাল ১৯৬৫ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তাঁর স্কুল নম্বর ছিল ৫৯৮। শেখ জামালের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্বদেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মানবিক শাখা হতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শেখ জামালের সেনাবাহিনীর প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। ১৯৭৪ সালের ২৯ জানুয়ারি যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ জামালের আগ্রহ তাঁকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। অতঃপর তিনি শেখ জামালকে যুগোস্লাভিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সেখানকার বিরুপ আবহাওয়া ও ভাষাগত কারণে তিনি পরবর্তীতে গ্রেট ব্রিটেনের **Sandhurst** এর সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের পোস্টিং হয় ঢাকা সেনানিবাসস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ব্যাটালিয়ন ডিউটি অফিসার এর দায়িত্ব পালন শেষে রাতে সেনানিবাসে অবস্থান না করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে ফিরে আসেন। ১৫ আগস্ট ভোরে একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের দ্বারা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল তোমার মৃত্যু নেই, তুমি আছো এবং চিরকাল থাকবে আমাদের হৃদয়ের গভীরে। সকল রেমিয়ান এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

তথ্য সূত্র: *https://www.banglatribune.com/youth/news/354369?fbclid=IwAR2qTpRV6_MIZ06Eu4IcIIaVAFGY53TQ__7TOqgKOX2osMkfvjCl_XYcw88*

সন্দীপন

বার্ষিকী প্রকাশনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক :	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ এনডিসি, পিএসসি
উপদেষ্টামণ্ডলী :	আসমা বেগম, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা ফাতেমা জোহরা, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা মোঃ ফিরোজ খান, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা
সম্পাদনা পর্ষদ-২০২১ :	সুদর্শন কুমার সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, গণিত রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক, চারু ও কারু কলা ত.ম. মালেকুল এহতেশাম লালন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা আসাদুল হক, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি প্রসূন গোস্বামী, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী, প্রভাষক, বাংলা মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি তামান্না আরা, প্রভাষক, বাংলা মোঃ জাকারিয়া আলম, প্রভাষক, ইংরেজি ফারজানা ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা নিশাত নওশিন, প্রভাষক, বাংলা রাফিয়া আক্তার, প্রভাষক, বাংলা মোঃ আবু রায়হান, প্রদর্শক, কম্পিউটার
মুদ্রণ তত্ত্বাবধান :	বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ-২০২১
আলোকচিত্র :	সুন্দরবন ফটোগ্রাফি এ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ইমরান খান, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
প্রচ্ছদ :	মাস্টার জাওয়াদ নাহিন, দশম শ্রেণি (প্রভাতি)
অলংকরণ :	সুদর্শন কুমার সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, (গণিত) রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক (চারু ও কারুকলা)
ডিজাইন :	গ্যালাক্সী ডিজাইন হাউজ, মিরপুর-১, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯১৩০৯৯৪১৭
মুদ্রণ :	গ্যালাক্সী ইন্টারন্যাশনাল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, ✉ glxyint@gmail.com
প্রকাশকাল :	এপ্রিল ২০২২

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ

নবাগত সভাপতির বাণী

মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই মানুষ নিজেকে এবং নিজের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে চায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে; সুপ্ত অনুভূতিগুলো পায় চিত্ররূপ বা বাণীরূপ। এই সৃজনপ্রয়াসী মানুষের প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজন অবারিত সুযোগ ও উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী বিকাশোন্মুখ শিক্ষার্থীদের জন্য তেমনই এক উর্বর ক্ষেত্র। 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত এ প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

'সন্দীপন-২০২১' এর দীপশিখাতুল্য নবীন লেখকেরাই একদিন প্রদীপ্ত সূর্যতুল্য হয়ে উঠবে এবং উদ্ভাসিত করবে দেশ ও জাতিকে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাদের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ ও শুভকামনা।

পরিশেষে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

বিদায়ি সভাপতির বাণী

ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানসিক উৎকর্ষ সাধনে পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা একান্ত প্রয়োজন। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে কলেজ 'বার্ষিকী'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'বার্ষিকী' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দর্পণ স্বরূপ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'বার্ষিকী' শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম।

শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সৃজনশক্তির বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ 'সন্দীপন-২০২১' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের স্বনামধন্য কলেজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষার পথিকৃৎ এ কলেজের শিক্ষার্থীরা অতিমারী করোনার প্রভাব অতিক্রম করে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সম্পৃক্ত থাকতে পেরেছে জেনে আমি তাদের সাধুবাদ জানাই। 'সন্দীপন-২০২১' এর প্রকাশনায় সাফল্য কামনা করছি।

পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ ও সাহিত্য বার্ষিকী 'সন্দীপন' প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকেই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
বিদায়ি সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' - এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রতিবছর তার গৌরবময় ঐতিহ্য ও সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। ছাত্রদের সুশিক্ষিত ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে শিক্ষার পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানে যেসব সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের নিয়মিত আয়োজন করা হয় সেগুলোর মধ্যে বার্ষিক কলেজ ম্যাগাজিন 'সন্দীপন' অন্যতম।

'সন্দীপন' এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও মনোজগতের বিকাশ ত্বরান্বিত করে। ছাত্ররা এখানে তাদের সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনাগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারে। প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে শিল্প-সাহিত্য চর্চা থেকে দূরে সরে যাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে কলেজের সাহিত্য বার্ষিকীর প্রকাশ একটি নিরাময়ক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি মনে করি।

'সন্দীপন' কলেজের প্রতিবিম্ব। কারণ এতে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল, খেলাধুলা, বিভিন্ন ক্লাবের কার্যক্রম, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে ছাত্রদের বিভিন্ন সফলতা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিবরণ স্থান পায়।

সবশেষে আমি 'সন্দীপন ২০২১' এর প্রকাশকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এর প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

কাজী শামীম ফরহাদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
এবং
প্রাক্তন রেমিয়ান, কলেজ নং : ২০৭১

সম্পাদকীয়

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বহন করছে। আমি আনন্দিত যে, একাডেমিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাহিত্যপ্রয়াসকে উদ্দীপ্ত ও সন্দীপিত করার উদ্দেশ্য করোনাকালেও 'সন্দীপন-২০২১' তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

কলেজ বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের জন্য খোলা আকাশের মতো। তাদের সৃজনশীল মনের বিচরণ এ খোলা আকাশে। সুকুমারবৃত্তি চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। সন্দীপনের এ সৃজনী প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের এনে দিয়েছে মুক্তির অনাবিল আনন্দ। শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম, কলেজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, ক্লাব প্রতিবেদন, বিভিন্ন সাফল্যের বিবরণী, স্মরণীয় মুহূর্তের চিত্র এবং স্মৃতির পাতায় চির অমলিন এবারের সন্দীপনে তুলে ধরা হয়েছে। সন্দীপনে প্রকাশিত লেখাগুলো শিক্ষার্থীদের অসীম চিন্তাধারা ও সৃজনশীল মনের প্রতীক। তাদের সুপ্ত বাসনাকে তারা লেখনী ও তুলির মাধ্যমে ফুটে তুলেছে। আমার বিশ্বাস এ সুকুমারবৃত্তি চর্চা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

'সন্দীপন-২০২১' প্রকাশে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করছেন তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে যাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়। তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা ম্যাগাজিনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের পাশাপাশি শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুদর্শন কুমার সাহা
আহ্বায়ক
'সন্দীপন' সম্পাদনা পর্ষদ-২০২১
এবং
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

২০২১ সালের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্যবৃন্দের নামীয় তালিকা

বোর্ড অব গভর্নরস

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাক্তন চেয়ারম্যান

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব),
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তেজগাঁও
অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
সদস্য

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অতিরিক্ত সচিব
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বর্তমানে-সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
সদস্য

মোঃ আলি কদর
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন
যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

প্রফেসর নেহাল আহমেদ
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
বর্তমানে- মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
সদস্য

রাশেদ আল মাহমুদ
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
সদস্য

কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি,পিএসসি
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, অধ্যক্ষ
সদস্য সচিব

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ

আসমা বেগম
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

ফাতেমা জোহরা
উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা

মোঃ ফিরোজ খান
উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ

ড. মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা বিভাগ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
দর্শন বিভাগ

জে.এম. আরিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস বিভাগ

অনাদিনাথ মন্ডল
গণিত বিভাগ

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটার বিভাগ

ত. ম. মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা বিভাগ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়ন বিভাগ

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গণিত বিভাগ

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

আসাদুল হক
ইংরেজি বিভাগ

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়ন বিভাগ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা বিভাগ

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ফাতেমা নূর
ইংরেজি বিভাগ

নুরুন্নাহার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি বিভাগ

প্রভাষকবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল বিভাগ

সাবরিনা শরমিন
ভূগোল বিভাগ

এ, কে, এম, বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ফারুক হোসেন
রসায়ন বিভাগ

মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
রসায়ন বিভাগ

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়ন বিভাগ

অসীম কুমার দাস
ভূগোল বিভাগ

দেওয়ান শামছুদ্দোহা
ইংরেজি বিভাগ

জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নূরুল ইসলাম
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত বিভাগ

হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলা বিভাগ

মোঃ হিসাব আলী
গণিত বিভাগ

মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত বিভাগ

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা বিভাগ

মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মশিউর রহমান
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি বিভাগ

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান বিভাগ

রাসেল আহমেদ
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি বিভাগ

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি বিভাগ

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল বিভাগ

আবদুল কুদ্দুস
দর্শন বিভাগ

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
ইংরেজি বিভাগ

হরিপদ দেবনাথ
রসায়ন বিভাগ

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা বিভাগ

আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়ন বিভাগ

ওমর ফারুক
গণিত বিভাগ

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক
গণিত বিভাগ

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সালেহ
গণিত বিভাগ

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা বিভাগ

তারেক আহমেদ
বাংলা বিভাগ

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি বিভাগ

তামান্না আরা
বাংলা বিভাগ

আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

টিচার্স গ্যালারি

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি বিভাগ

মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলামশিক্ষা বিভাগ

ফারজানা ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পৌরনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত বিভাগ

মোঃ সোলাইমান আলী
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

দুলাল চন্দ্র দাস
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মো. মুজাহিদ আতীক
বাংলা বিভাগ

মোঃ তারিকুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ আফজাল হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

নিশাত নওশিন
বাংলা বিভাগ

আছমা খাতুন
বাংলা বিভাগ

মো. মাঈদুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

আফসানা আক্তার
বাংলা বিভাগ

মোঃ রাফসানুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ ফোরকান
রসায়ন বিভাগ

সানজিদা আফরিন অনু
ইংরেজি বিভাগ

রাফিয়া আক্তার
বাংলা বিভাগ

মো. এনামুল হাসান
রসায়ন বিভাগ

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
কম্পিউটার বিভাগ

ফারহানা আক্তার
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

পরেশ চন্দ্র রায়
গণিত বিভাগ

সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

ভারত চন্দ্র গৌড়
ক্রীড়া বিভাগ

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
ক্রীড়া বিভাগ

প্রণব হাওলাদার
হিন্দুধর্ম বিভাগ

বর্নালী ঘোষ
সঙ্গীত বিভাগ

প্রদর্শকবৃন্দ

মোঃ কামাল হোসেন
কম্পিউটার বিভাগ

ওয়াহিদা সুলতানা
ভূগোল বিভাগ

মোঃ রমজান আলী
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ জুবায়ের হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মো. গোলাম আজম
রসায়ন বিভাগ

মোঃ শামীম আহমেদ
রসায়ন বিভাগ

মোঃ হাসান শেখ
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মৌসুমী আখতার
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু রায়হান
কম্পিউটার বিভাগ

মোঃ মামুন মিয়া পাঠান
গণিত বিভাগ

সুমাইয়া খানম
ভূগোল বিভাগ

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ

সাগর চন্দ্র দাস
প্রভাষক, চারু ও কারুকলা

আফরোজা লাবনী
প্রভাষক, আই সি টি

মোঃ হাসান মাসরুর খান
প্রভাষক, আই সি টি

এস.এম সোহেল রানা
প্রভাষক, রসায়ন

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
প্রভাষক, গণিত

খ. ইনতিশার স্বাক্ষর
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

টিচার্স গ্যালারি

মোঃ আলী মর্তুজা মণ্ডল
প্রভাষক, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা

মো: ইয়াকুব আলী
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা

মোঃ কনক রেজা
প্রভাষক, বাংলা

মোহাম্মদ ফেরদৌউস
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ সনি মিয়া
প্রভাষক, গণিত

মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ মাহমুদুল হাসান আলম
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা

মোঃ আবু নাসের
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

শিশির কুমার রায়
প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা

মোঃ হাবিবুল্লাহ
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা

সুজিত কান্তি রায়
প্রভাষক, ইংরেজি

মোঃ আরিফুল ইসলাম
প্রভাষক, অর্থনীতি

মোঃ নাছিরুল হক
প্রভাষক, শারীরিক শিক্ষা

জেবুননেছা আলী
প্রভাষক, মার্কেটিং

নাহিদ আক্তার
প্রভাষক, বাংলা

মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম
প্রভাষক, রাস্ট্রবিজ্ঞান

জান্নাত-ই-নুর
প্রভাষক, ইংরেজি

আয়শা আক্তার ঝিলিক
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা

মোঃ ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

এম. মাহফুজুল হক
সহকারী শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফারজানা আক্তার তানিয়া
প্রভাষক, আই সি টি

রীনা রানী রায়
সহকারী শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

বেনজীর আহমেদ
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মুহাঃ আমীমুল ইহসান
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

হাজেরা খাতুন
সাইকোলজিস্ট (সাময়িক)

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

ফরিদ আহমেদ
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মতিয়ার রহমান
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

মোঃ অছিউর রহমান
সহকারী স্টোর কর্মকর্তা

মোঃ আমীর সোহেল
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মাইনুল ইসলাম
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর

মোঃ জুলফিকার আলী ভূট্টো
সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ তৌফিক আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

খন্দকার ওয়ালিদ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর (শিক্ষা)

মসজিদের স্টাফ

মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন
ইমাম

মোঃ হাসানুজ্জামান
খাদেম

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
হিসাব রক্ষক

সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
প্রধান সহকারী

আল-মামুন
পিএ টু প্রিন্সিপাল

রিপন মিয়া
হিসাবরক্ষক

মোঃ রবিউল ইসলাম
ফার্মাসিস্ট

মোঃ গোলাম মোস্তফা
ফার্মাসিস্ট

মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
উচ্চমান সহকারী

মোঃ শহীদুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী

মোঃ মাহবুব হাসান
উচ্চমান সহকারী

রওশন আরা সাথী
মেট্রন

মুনিরা বেগম
মেট্রন

মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড

দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড

তানজিম হাসান
স্টুয়ার্ড

মোঃ মঞ্জুরুল হক
স্টুয়ার্ড

মোঃ সুহেল রানা
স্টোর কিপার

মোঃ আফজাল হোসেন
স্টোর কিপার

মোঃ মঈনুল হাসান
গ্রাউন্ডস সুপারিনটেনডেন্ট

হাসিনা খাতুন
অফিস সহকারী

হেমায়েত হোসেন
অফিস সহকারী

মোঃ আমিনুর ইসলাম রেজোয়ান
অফিস সহকারী

মোঃ সাইদুল ইসলাম
অফিস সহকারী

মোঃ আল-আমিন খোন্দকার
অফিস সহকারী

মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

ইমরান খান
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ খাইরুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

সুরাইয়া আক্তার
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ লিটন মিয়া
স্টোর এ্যাসিসটেন্ট

মঈনুল ইসলাম শোভন
টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড

ইসরাফিল শেখ
ড্রাইভার (লাইট)

মোঃ শরিফ আকন্দ
ড্রাইভার (লাইট)

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

জিয়াউর রহমান
ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক্স মেশিন অপারেটর

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ খাইরুল ইসলাম
ইলেকট্রিশিয়ান

আব্দুল মান্নান সিকদার
প্লাম্বার

মোঃ ইয়ার আলী
বাবুর্চি

মোঃ আব্দুল জলিল
বাবুর্চি

মোঃ মোস্তফা
বাবুর্চি

মোঃ কামাল হোসেন
বাবুর্চি

মোঃ সোহরাব হোসেন
বাবুর্চি

মোঃ জীবন ইসলাম
বাবুর্চি

মোঃ রেজাউল আলম খান
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ জিন্নাহ
কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী)

মোঃ ওসমান আলী
ওয়্যারম্যান

মোঃ মফিজুল ইসলাম
ওয়্যারম্যান

সাইফুল ইসলাম
ওয়্যারম্যান

নূর মোহাম্মদ কাজল
সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ আব্দুল হালিম রেজা
সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান

তপন কুমার পাল
পাম্প অপারেটর

তাইজুল ইসলাম মোল্লা
সহকারী প্লাম্বার

মোঃ আয়াতুল্লাহ
সহকারী কার্পেন্টার

মোঃ সোহরাব আলী
মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেলপার

মোঃ দারুল মিয়া
পেইন্টার (রং মিস্ত্রী) হেলপার

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ জাকির হোসেন
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ খলিলুর রহমান
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ ফারুকুল ইসলাম হাওলাদার
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ সোহাগ মিয়া
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ আইয়ুব আলী
ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট

মোঃ মনির হোসেন
হেড মালি

মোঃ মোস্তফা
হেড গার্ড

সঞ্জীত চন্দ্র দাস
হেড সুইপার

মোঃ আবজাল হোসেন
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ আব্বাছ আলী
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী বাবুর্চি

সাইফুল ইসলাম
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ সোয়ানুর রহমান
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ মহিরুল হক
সহকারী বাবুর্চি

মোঃ শহীদুল ইসলাম
মেট

মোহাম্মদ বদিউর রহমান
মেট

মোঃ নূরে আলম সিকদার
মেট

মোঃ সেলিম
টেবিলবয়

মোঃ আমিনুল ইসলাম
টেবিলবয়

গাজী মস্তফা কামাল
টেবিলবয়

মোঃ মোকছেদুল হক
টেবিলবয়

মোঃ আব্দুল বাছেদ
টেবিলবয়

মোঃ আব্দুল্লাহ
টেবিলবয়

মোঃ আকিবুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম
টেবিলবয়

সেলিম মিয়া
টেবিলবয়

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ রাসেল
টেবিলবয়

মোঃ জাকির হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ মজিবুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ সাহাদাত হোসেন
ওয়ার্ডবয়

আবদুল জলিল মিয়া
ওয়ার্ডবয়

আবদুস সালাম মিঞা
নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট

মোঃ আবু সায়েদ
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট

মোঃ ইউনুস
লাইব্রেরি এটেনডেন্ট

মোঃ আহসানুল হক
টেক্সটবুক রেয়ারার (স্টেশনারী)

মোঃ আবুল কালাম
এমএলএসএস

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
এমএলএসএস

মোঃ আবদুর রশিদ (৪)
এমএলএসএস

মোঃ আব্দুর রশিদ শেখ
এমএলএসএস

মোঃ আব্দুল কাদের
এমএলএসএস

মোঃ খালেদ পারভেজ
এমএলএসএস

মোঃ মজিবুর রহমান
এমএলএসএস

রাহাত আহমেদ
এমএলএসএস

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
এমএলএসএস

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন
এমএলএসএস

মোঃ সাব্বির উদ্দিন
এমএলএসএস

আশরাফ হোসেন
এমএলএসএস

মোসাঃ শিউলী আক্তার
এমএলএসএস

মোঃ নাজিম উদ্দিন
এমএলএসএস

মোঃ মোকলেচুর রহমান
স্টোর অর্ডারলি

শ্রী কৃষান দাস
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ মন্টু মোল্লা
মালি (সেন্ট্রাল)

মুকুল
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ শহীদুল ইসলাম
হাউস মালি

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন
হাউস মালি

মোঃ নাসির উদ্দিন
হাউস মালি

মোঃ ইমদাদুল হক
হাউস মালি

মোঃ লাভলু মিয়া
হাউস মালি

মোঃ মনছুর আলী
হাউস মালি

মোঃ আজমল হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ সহিদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ জাহিরুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)
গ্রাউন্ডসম্যান

মুহাম্মদ শরীফ হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ হানিফ
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ নজরুল ইসলাম
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ কুদ্দুস মোল্লা
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ আনোয়ারুল হক
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ মোকছেদ আলী খাঁ
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ কামাল হোসেন
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ ফারুক শিকদার
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ জহুরুল ইসলাম সেখ
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ জালাল উদ্দিন
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁন
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ নবীজল ইসলাম
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ রাসেল আলী
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ খলিলুর রহমান
নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

মোঃ রেজাউল ইসলাম
গেইট দারোয়ান

হাফিজ মোল্যা
গেইট দারোয়ান

আবু ছাহিদ দিপু
গেইট দারোয়ান

সোহেল আমিন
গেইট দারোয়ান

মোঃ আব্দুর রহমান
হাউস গার্ড

মোঃ শহিদুজ্জামান
হাউস গার্ড

মোঃ রাসেল বেপারী
হাউস গার্ড

মোছাম্মৎ লাইলী আক্তার
সুইপার (মেডিকেল)

আকলিমা বেগম
সুইপার (মেডিকেল)

তিমথী পেনাপেল্লী (সবুজ)
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ হাজারুল ইসলাম
সুইপার সেন্ট্রাল

সুজন কুমার পাল
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ ছলেমান
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ সুমন
সুইপার সেন্ট্রাল

মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বাবু
হোস্টেল সুইপার

এ জেড এম মাইনুল আকবর
হোস্টেল সুইপার

মোঃ রিপন শেখ
হোস্টেল সুইপার

সঞ্জয় কুমার
হোস্টেল সুইপার

মোঃ হানিফ
সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২

মোঃ স্বপন হোসেন
সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২

মোঃ রিপন আলী
সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২

পি. জেমস লুক
সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২

মোঃ মানিক মিয়া
সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২

পারভেজ হাসান
এমএলএসএস (খণ্ডকালীন)

অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রধান শাখা, মেডিকেল এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে চীফ কো-অর্ডিনেটর, ক্লাব মডারেটর ও প্রেসিডেন্ট

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যক্ষের সাথে বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক এবং বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে গ্রুপ ছবি

অধ্যক্ষের সাথে বিএনসিসি শিক্ষক এবং ক্যাডেট দল

অধ্যক্ষের সাথে স্কাউট শিক্ষক ও স্কাউট দল

সূচিপত্র

বিষয় শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১. হাউস প্রতিবেদন	২৮
২. বহুমাত্রিক অর্জন, সফলতা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	৩৫
৩. টিচার্স কর্নার	৪১
৪. স্টুডেন্টস কর্নার	৫৪
৫. গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি	৬৫
৬. ENGLISH SECTION	১০০
৭. চিত্রশৈলী ও ফটোগ্রাফি	১২৩
৮. ক্লাব পরিচিতি	১৩০
৯. স্টুডেন্টস গ্যালারি	১৫৮
১০. স্মৃতির পাতায় বর্ণিল-২০২১	২০৪
১১. স্মৃতি অমলিন	২১২

ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস

ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৭টি আবাসিক হাউসের মধ্যে কুদরত-ই-খুদা হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এই হাউসটি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে নির্মিত প্রথম আবাসিক হাউস। স্থাপনের সময় এ হাউসের নাম ছিল জিন্নাহ্ হাউস। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় ১ নম্বর হাউস এবং পরবর্তী কালে দেশমাতৃকার অমর সন্তান, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির। নানা ইতিহাস ঐতিহ্যসহ স্বর্ণালি স্মৃতি ধারণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাউসটি। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের দেয়ালে শোভাবর্ধন করছে কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য মুরাল। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৭টি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৫টি বিশেষ কক্ষ। এছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিংহল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম।

এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। হাউসটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন মেট্রনসহ ১০ জন স্টাফ। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের রয়েছে সফলতার এক গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত PEC ও JSC পরীক্ষায় সকল ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে PEC ও JSC পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই হাউসটি ২০১১ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২০১৮ সাল ব্যতীত সকল বছর এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০১৬ সাল (রানার আপ) ব্যতীত অন্যান্য বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা ১২ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কুদরত-ই-খুদা হাউস। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ৩য়-৫ম শ্রেণির আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এ হাউস ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে পরপর ৩ বার আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করে।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : ফাতেমা নূর
হাউস টিউটর : আয়েশা খাতুন
হাউস এল্ডার : মিনহাজুল ইসলাম মাহিন
হাউস প্রিফেক্ট : তানভির আহমেদ

জয়নুল আবেদিন হাউস

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৭টি আবাসিক হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো জয়নুল আবেদিন হাউস। ১৯৬১ সালের মে মাসে 'আইয়ুব হাউস' নামে এ হাউসটির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, বাংলাদেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম অনুসারে এ হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জয়নুল আবেদিন হাউস। হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং মনোরম। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দ্বিতল হাউসটির সবুজ শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। হাউসটির দেয়ালের শোভা বর্ধন করেছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি সুন্দর বাগান। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৮টি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৪টি বিশেষ কক্ষ। এছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ জন কর্মচারী এবং ১ জন মেট্রন নিযুক্ত আছেন। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোর বেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই করে রুটিন মাফিক। এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে PEC এবং JSC পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। তবে ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা সংক্রমণের কারণে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল PEC এবং JSC পরীক্ষার্থীদের অটোপাস দেওয়া হয়েছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে, তাছাড়া ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সাল পর্যন্ত রানার আপ হয় এ হাউসটি। ২০১৮ সালে জয়নুল আবেদিন হাউস বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৯ ও ২০২০ সালে রানার আপ হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় টানা চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালে রানার আপ হয়। এই হাউস ২০১৭ সালের দেওয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০২০ সালে পুনরায় দেওয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০১৯ সালের অন্যতম আর্কষণ ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় জয়নুল আবেদিন হাউস।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে রয়েছে যেমন গভীর হৃদ্যতা, তেমনি রয়েছে ছাত্রদের সাথে শিক্ষক, কর্মকর্তাকর্মচারীদের সুনিবিড় সম্পর্ক। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা জয়নুল আবেদিন হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : মো: খায়রুল আলম
হাউস টিউটর : সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
হাউস এল্ডার : রুহানুল হক তালুকদার আরাফ
হাউস প্রিফেক্ট : স্নেহাশীষ ভৌমিক রাতুল

জসীমউদ্‌দীন হাউস

"কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।"

-জসীমউদ্‌দীন

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের রুপাইয়ের মতো ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক ছাত্র যেন একেকটি নবীন তৃণ। শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ পরিচর্যায়, অভিভাবকদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় এবং কলেজের বিশাল খোলা মাঠের মুক্ত আলো-বাতাসে এই নবীন তৃণগুলো যেন ফুলের মত প্রস্ফুটিত হতে থাকে। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর অপূর্ব সমন্বয়ে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজের হাউসসমূহ। কলেজের সাতটি হাউসের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন হাউস নবীন সংযোজন। দিবা জুনিয়র শাখার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, একতা, খেলাধুলায় নৈপুণ্য অর্জন তথা সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ২০০৮ সালে বাংলা সাহিত্যের পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের নামানুসারে এই হাউসটির নামকরণ করা হয়। ২০১৯ সালে অফিস আদেশের মাধ্যমে শিক্ষা ভবন-২ এর ২০৬ নম্বর কক্ষটিকে এ হাউসের অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়।

হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর ও একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এই হাউসের ছাত্ররা মনে প্রাণে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি পাবলিক পরীক্ষা পিইসি ও জেএসসিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। অ্যাকাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০২১ সালে জমীমউদ্‌দীন হাউস আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় কিশলয় গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন এবং অঙ্কুর গ্রুপে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২০ সালে হাউসটি ৬০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি ক্রিকেটে রানার আপ, ব্যাডমিন্টনে যৌথ চ্যাম্পিয়ন এবং বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। হাউসটি ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখে চলেছে। কলেজের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জসীমউদ্‌দীন হাউস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে এবং করবে ইনশাআল্লাহ।

একটি জাতিকে সকলক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি সৃজনশীল এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশই পারে ছাত্রদেরকে সুন্দর আগামীর জন্য প্রস্তুত করতে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জসীমউদ্‌দীন হাউস ছাত্রদেরকে সেই চমৎকার পরিবেশ উপহার দিতে সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হাউস মাষ্টার : মো : শাহরিয়ার কবির
হাউস টিউটর : মো : রাফসানুর রহমান
হাউস এল্ডার : আরাফাত ইসলাম তামিম
হাউস প্রিফেক্ট : রাশিক রাইয়ান প্রয়াস

ফজলুল হক হাউস

"কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান।"

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য, এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্বায়ত্বশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। এই কলেজের ৭টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হাউস। দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, কৃষক বন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট বড় ২৮টি কক্ষ। এছাড়াও রয়েছে একটি কমনরুম এবং সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি, মেট ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতাসহ একজন সুনাগরিকের নানারকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হাউস প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হাউসটিতে বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। "ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ" এ সংস্কৃত শ্লোকে ছাত্ররা মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিন মাফিক করে থাকে। এর মধ্যে তাদের পড়াশোনার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়ে থাকে সর্বাগ্রে।

শুধু শিক্ষামূলকই নয়, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমেও ছাত্ররা বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ২০১৮ সালে ৫৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফজলুল হক হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একই বছরে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। করোনাকালীন ছুটির পূর্বে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একইসাথে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ফজলুল হক হাউস রানার আপ হয়। আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা তাদের কৃতিত্ব অব্যাহত রাখে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ফজলুল হক হাউসের সাফল্যের এই ধারা অব্যহত থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
হাউস টিউটর : মোঃ জুবায়ের হোসেন
হাউস এল্ডার : সৌমিত্র শর্মা উৎস
হাউস প্রিফেক্ট : মোঃ নাইমুর রহমান

নজরুল ইসলাম হাউস

আকাশী নীল রঙের হাউস পতাকার নীচে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিটি ছাত্রের মনে প্রাণে গতিশীলতার ছন্দ--------

চল্ চল্ চল্!
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল।

বিদ্রোহ, তারুণ্য, স্বদেশপ্রেম, সাম্য, ঐক্য, অসাম্প্রদায়িকতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই হাউসটির আকাঙ্ক্ষার সাথে সুশিক্ষার প্রাপ্তিযোগ, সত্যের সাথে স্বপ্ন আর বিদ্রোহের সাথে দেশপ্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণে নজরুল ইসলাম হাউস যেন সুদক্ষ কারিগরের এক সুনিপুণ সূতিকাগার। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত এই দ্বিতল হাউসটির অবকাঠামো সুপরিকল্পিত, দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়। এই হাউসের সামনে রয়েছে অত্যন্ত মোহনীয় একটি পুষ্পকানন। এছাড়া হাউসটির চতুর্পাশে শোভাবর্ধন করছে বিভিন্ন ফলদ ও কাষ্টল বৃক্ষ। এ হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত ২৮ টি কক্ষ, ১টি পূর্ণাঙ্গ কমনরুম ও ১টি সুবিশাল ডাইনিং হল। ছাত্রদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউজের সাথে রয়েছে হাউস টিউটরের বাসভবন। ছাত্রদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, দেশপ্রেম বিকশিত করার জন্য হাউসে ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন হাউজ মাস্টার, একজন হাউজ টিউটর এবং ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০ জন কর্মচারী। হাউজের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে আন্তরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা তেমনি ছাত্রদের সাথে শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক।

প্রাতিষ্ঠানিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের সুবিশাল অর্জন ঈর্ষণীয়। ভোরবেলার পিটি থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সকল কাজই হাউসের ছেলেরা রুটিন মাফিক করে থাকে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফলও হয় প্রশংসনীয়। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি ২০২২ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হাউসের প্রায় সকল ছাত্র জিপিএ ৫ পেয়েছে। ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতায় এই হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। চলতি বছরের পূর্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হ্যাটট্রিক করার সাফল্য অর্জন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহীদ শেখ জামাল ও বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু এবং আরো অনেক দেশ বরেণ্য প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এ হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সকল কৃতিত্ব ও গৌরব হোক মানবতার জন্য এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

হাউস মাস্টার : জি. এম. এনায়েত আলী
হাউস টিউটর : মো: নাহিদুল ইসলাম
হাউস এল্ডার : মো: আরেফিন ফাহিম
হাউস প্রিফেক্ট : মোঃ মেহেদী হাসান

লালন শাহ হাউস

"ও যার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।"
- ফকির লালন শাহ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাতটি আবাসিক হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসাবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩ নং হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক 'লালন শাহ' এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'। ২০১৯ সাল থেকে হাউসটির সংস্কার কাজ শুরু হয়। গত ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মাহবুব হোসেন হাউসটির সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন। সংস্কার কাজ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন কলেজের ও এই হাউসের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ। বিশ্বব্যাপী অতিমারি কোভিড-১৯ এর কারণে ৫৪৪ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পরে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলে এবং তার দু'দিন পূর্বে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ছাত্ররা হাউসে উঠে। ফলে হাউসে পুনরায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে।

পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্ঠিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়। হাউসের সামনে রয়েছে তিনটি অংশে বিভক্ত চিত্তাকর্ষক গার্ডেন। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাস ভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৩১টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১২৬ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই এ হাউসে অবস্থান করে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, মসজিদ, কমনরুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এ ছাড়া তাঁদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০ জন কর্মচারি। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সংস্কৃতবোধ, দেশপ্রেম, সততা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে হৃদ্যতা, তেমন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায়ও এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা-মূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০২২ ও আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আংশিক সম্পন্ন আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার্সআপ অবস্থানে রয়েছে। এ ছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

হাউস মাস্টার : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
হাউস টিউটর : মোঃ শফিকুল ইসলাম
হাউস এন্ডার : মোঃ জোবায়ের মোল্লা
হাউস প্রিফেক্ট : প্রিয়ন্ত মজুমদার অনিক

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাতটি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এ হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০ মার্চ ২০০৮ সালে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। হাউসের আসনসংখ্যা ৮৮। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে হাউসটি প্রভাতি শাখার আবাসিক ছাত্রদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুইজন টেবিলবয়, একজন ওয়ার্ডবয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড।

হাউসের সামনে এবং দুই পাশে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান, বিভিন্ন প্রজাতির শোভাবর্ধক ও ফুলের গাছে বাগানটি সমৃদ্ধ। হাউসের সামনে রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মনজুড়ানো অনুভূতি জাগে, শান্তির স্পর্শে প্রাণ ছুঁয়ে যায়। পাঁচতলা বিশিষ্ট এ হাউসের প্রত্যেক তলায় রঙিন আলোর বিচ্ছুরণ হাউসের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতো মহামানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসায় নিজেদের সমর্পণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নবীন হাউস হিসেবে কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ হাউসের অর্জনও কম নয়। ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ ও ২০২০ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছে। ২০১৭ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৫ ও ২০১৮ সালে রানারআপ হয়। ২০১৮ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রানারআপ হয়। আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ২০১৯ ও ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ ও ২০২০ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এভাবেই এ হাউসের ছাত্ররা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

হাউস মাস্টার : মোঃ নূরুল ইসলাম
হাউস টিউটর : তারেক আহমেদ
হাউস এল্ডার : মোঃ মমিনুল ইসলাম মুন
হাউস প্রিফেক্ট : সাইদুল ইসলাম

বহুমাত্রিক অর্জন, সফলতা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সহযোগিতায় : মোহাম্মদ নূরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

বহুমাত্রিক অর্জন, সফলতা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অনন্য এবং উৎকর্ষ সাধনে অদম্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট(ডে) চালু করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে প্রায় ৫৫০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাকাডেমিক পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর সুষম বর্ধন, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করা, যাতে তারা সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির মূলমন্ত্র- 'শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, সেবা এবং দেশপ্রেম'; উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই প্রশংসনীয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে ২০২১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে সেগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষাবোর্ড ফলাফল প্রণয়ন করে। নিচে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো :

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২১

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা	জিপিএ- ৫	পাশের হার
বিজ্ঞান	৪১৩	৪১৩	৪০২	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	২৬	২৬	২১	১০০%
মানবিক	৩০	৩০	৪	১০০%
মোট =	৪৬৯	৪৬৯	২২৭	১০০%

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২১

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা	জিপিএ- ৫	পাশের হার
বিজ্ঞান	৮৪৫	৮৪৫	৮২৯	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	৭৯	৭৯	৫৩	১০০%
মানবিক	১২২	১২২	৮৮	১০০%
মোট =	১০৪৬	১০৪৬	৯৭০	১০০%

অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড-২০২১

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সময়োপযোগী বহুমুখী অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। বর্তমান অধ্যক্ষ স্যার কর্তৃক গৃহীত কিছু অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। নিম্নে ২০২১ সালের কিছু উন্নয়নমূলক অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা হলো :

- অনলাইনে সকল শ্রেণির সকল বিষয়ে Topic অনুযায়ী ছাত্রদের জন্য লেকচার শিট প্রদান।
- অনলাইনে সকল শ্রেণির সকল বিষয়ে Topic অনুযায়ী Multimedia Presentation এর মাধ্যমে লেকচার প্রদান।
- ৯৮% ছাত্রের অংশগ্রহণে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সকল ছাত্রের অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ।
- ZOOM Cloud Meeting Apps এর মাধ্যমে দৈনিক রুটিন অনুযায়ী সকল ছাত্রের শ্রেণিপাঠদান অব্যাহত থাকে।
- আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের Start up Bangladesh Gi Pilot Project এর অংশ হিসেবে কলেজের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের অনলাইনে ক্লাসগ্রহণ।
- সংসদ টেলিভিশনের ক্লাস রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় এই কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের লেকচার প্রদান।
- ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে করোনা পরবর্তী কলেজ খোলার পর অভিভাবকগণের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় সভা।
- অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ৪টি সভা করা হয়েছে।
- কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রদের অভিভাবকদের সাথে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অনলাইনে অধ্যক্ষ মহোদয় মতবিনিময় করার মাধ্যমে করোনাকালীন সময়ে ছাত্রদের মানসিক বিকাশে ও নিয়মিত অধ্যয়ন এর ব্যাপারে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের করণীয় বিষয়ে অলোকপাত করেন।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য-২০২১

ছাত্রদের সুস্থ-সুন্দর মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বছরব্যাপী সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আন্তঃহাউজ মঞ্চ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শোক দিবস, শিশু দিবস, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া কলেজের বাইরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্ররা উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং আকর্ষণীয় সফলতাও অর্জন করে চলেছে। নিচে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো :

* ১৫ মার্চ হতে ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে Dakshita Art Delhi ভারত কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক অনলাইন চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অত্র কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র জাওয়াদ মুহাম্মদ নাহিন **প্রথম** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* অত্র কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র মো: ফারহান গাজী GRACE Presents Quarantine Blog প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং হিউম্যান ফর হিউম্যান কর্তৃক আয়োজিত The Story Completion Competition প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উপলক্ষে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ক্যাম্পেইন এ অংশ নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি বিশেষ সম্মাননা অর্জন করেন।

* স্কলাস্টিকা ম্যাথমেটিক্স ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের গণিত ক্লাব অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

*ক্যাপটিন আর্থ কর্তৃক আয়োজিত গেইমিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অত্র কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ হাসান প্রথম রার্নাস আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র এস এম আবতাহী নূর **প্রথম** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* নটর ডেম রোটারাক্ট ক্লাব 'লীডারশিপ সামিট ২০২১' এর Public Speaking প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফারহান লাবীব শিহাব প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* নটরডেম রোটারাক্ট ক্লাব আয়োজিত Leadership Summit-2021Gi Case Solving এ **প্রথম** স্থান লাভ করে অত্র কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এইচ এম শামিম রেজা।
* নটরডেম রোটারাক্ট ক্লাব "লেডারশিপ সামিট ২০২১' এর রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অত্র কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র মো: তাহমিদ ইসলাম দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু উৎসব-২০২১ এ চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অত্র কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র জাওয়াদ মুহাম্মদ নাহিন দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
* ২৯ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম আয়োজিত আন্ত:কলেজ বিতর্কে ১ম রাউন্ডে বিজয়ী হয় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতর্ক দল।

* সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন (CEE) কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মো. রাফিদ হাসান তৃতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* Bangladesh youth shines in global yoga blogging contest প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এ কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র মানসিফ হেলালী তৃতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
* বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম আয়োজিত আন্ত:কলেজ বিতর্কে ২য় রাউন্ডে বিজয়ী হয়ে অত্র কলেজের বিতর্ক দল কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।

* গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে 'স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু' বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মো: রাফিদ হাসান দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
* শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান উৎসব প্রতিযোগিতায় টিম কুইজ অত্র কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ওমর বিন আরিফ **প্রথম** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
* শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান উৎসব প্রতিযোগিতায় টিম কুইজ অত্র কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র আবরার বিন নাসের **প্রথম** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
* শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান উৎসব প্রতিযোগিতায় টিম কুইজ ও সোলো কুইজ এ অত্র কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র রাদ চৌধুরী **প্রথম** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* কলেজের নব নিযুক্ত সাইকোলজিস্ট কর্তৃক ২০২১ সালে অনেক ছাত্রকে ইন্টারনেট আসক্তি, ড্রাগ আসক্তি, পড়াশোনায় অমনোযোগিতাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

* বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের উল্লিখিত ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সাফল্য অর্জন নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। কলেজ কর্তৃপক্ষের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের যথাযথ অনুশীলন ও পরিচর্যার কারণেই সম্ভবপর হয়েছে এ গৌরব অর্জন। আগামী দিনগুলোতেও বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড-২০২১

শিক্ষা ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি রুদ্ধ হলে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মপ্রবাহে আসে স্থবিরতা, ব্যর্থতা ও হতাশা। আবার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। নিম্নে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

* ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে লালন শাহ হাউস সংস্কার কাজ শুভ উদ্বোধন করেন মোঃ মাহবুব হোসেন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।
* প্রশাসন ভবন সংস্কার করা হয়েছে।
* প্রশাসন ভবনের দক্ষিণ দিকের কলাপসিবল গেইটের তিন দিকে সিরামিক টালি স্থাপন করা হয়েছে।
  কলেজের ১ ও ২নং টিচার্স কোয়ার্টার এ ওভার হেড ট্যাংক এবং রিজার্ভ ট্যাংক স্থাপন করে রিজার্ভ ট্যাংক হতে প্রতিটি ইউনিটে নতুন পানির লাইন ওয়্যারিং করা হয়েছে।
* কলেজের পূর্ব ও পশ্চিম গেইট সংলগ্ন অভিভাবক সেডের পার্শ্বে হাত ধোয়ার বেসিন বসানো হয়েছে।
  কলেজের ৪ টি হাউসের অভ্যন্তরে ডিস্টেম্পার করা হয়েছে।
* কলেজের হাউসসমূহে সিলিং, দেয়াল, ড্রপ ওয়াল, প্যারাপেট ওয়াল সমূহের যেসব স্থানে ড্যাম্প ছিল সেসব স্থান নতুন করে প্লাস্টার করা হয়েছে।
* সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের জন্য ২টি অফিস কক্ষ প্রস্তাব করা হয়েছে।
  টিচার্স কোয়ার্টার-৪ ধানসিঁড়ি এর ৩টি বাসার রান্নাঘর, টয়লেট, গোসলখানা ও স্টোর রুমে ফ্লোর টাইলস ও ওয়াল টাইলস স্থাপন এবং পুরো বাসার অভ্যন্তরে ডিস্টেম্পার করা হয়েছে। এছাড়া এই কোয়ার্টারে একটি ওভারহেড পানির ট্যাংক স্থাপন করার মাধ্যমে ঐ ভবন এর তৃতীয় তলায় ০২টি ইউনিটে পানি সরবরাহ স্বল্পতা নিরসন করা হয়েছে।
* শিক্ষাভবন-১ এর সামনের বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানচিত্র দুটি সংস্কার করা হয়েছে।
* শিক্ষাভবন-২ এর সামনের গ্লোবটি সংস্কার করা হয়েছে।
* কুদরত-ই-খুদা হাউসের রান্না ঘরের বারান্দায় এমএস গ্রিল লাগানো হয়েছে।
* প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সহকারী স্টোর কর্মকর্তার অফিসকক্ষ সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে।
* বাস্কেটবল গ্রাউন্ড সংলগ্ন ড্রেন এর উপর স্লাব তৈরীকরণসহ এর পোস্টসমূহ মেরামত করা হয়েছে।
* শিক্ষাভবন-২ এর বারান্দা ৬ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত ডিস্টেম্পার করা হয়েছে।
* তায়কোয়ান্ডো সেড সংলগ্ন স্থাপনাটিকে সংস্কার করে ব্যাচেলর কোয়ার্টার এ রুপান্তর করা হয়েছে।
  টিচার্স জিমনেশিয়াম ও ক্লাব নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
* কলেজ পুকুর সংলগ্ন জিআই নেট বাউন্ডারী উত্তর দিকে সরিয়ে এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে।
  বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আওতায় শহীদুল্লাহ হাউস সংলগ্ন একটি আম বাগান করা হয়েছে।
* প্রশাসন ভবন এর উপরে কলেজের LED নাম ফলক স্থাপন করা হয়েছে।
* ২৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর সকল সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ড এর সভাপতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর মাননীয় সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন নতুন ০৬ তলা কর্মচারী কোয়ার্টার কৃষ্ণচূড়া অনলাইনে উদ্বোধন করেন ও অধ্যক্ষের মাধ্যমে বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে চাবি হস্তান্তর করেন।
* ১৪ জুন ২০২১ তারিখে কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর সাথে ১০ বছর মেয়াদী গ্রুপ বীমার চুক্তি সম্পন্ন করা হয়।

ক্রমাগত উন্নয়নের ধারা বেয়ে এ অনন্যসাধারণ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

টিচার্স কর্নার

THE TEACHERS' CORNER

মোঃ ফিরোজ খান
সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত নবি রাসুলদের নাম

"মহা পরাক্রমশালী পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা নবি ও রাসুলদের একটি উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন: তা হলো মানুষকে কুফরীর অন্ধকার থেকে ইমানের আলোর দিকে নিয়ে আসা।"

আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্য আদম (আ.) হতে শুরু করে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এদের মধ্যে হতে মাত্র কয়েকজন পয়গম্বরের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র. নং	নাম	ক্র. নং	নাম
১.	হযরত আদম (আ.)	১৪.	হযরত ইউনুছ (আ.)
২.	হযরত ইদ্রিছ (আ.)	১৫.	হযরত মুসা (আ.)
৩.	হযরত নূহ (আ.)	১৬.	হযরত হারুন (আ.)
৪.	হযরত হুদ (আ.)	১৭.	হযরত খিজির (আ.)
৫.	হযরত সালেহ (আ.)	১৮.	হযরত ইলইয়াস (আ.)
৬.	হযরত ইব্রাহীম (আ.)	১৯.	হযরত দাউদ (আ.)
৭.	হযরত লূত (আ.)	২০.	হযরত সুলায়মান (আ.)
৮.	হযরত শুয়াইব (আ.)	২১.	হযরত জাকারিয়া (আ.)
৯.	হযরত ইসমাইল (আ.)	২২.	হযরত ইয়াহইয়া (আ.)
১০.	হযরত ইসহাক (আ.)	২৩.	হযরত উযাইর (আ.)
১১.	হযরত ইয়াকুব (আ.)	২৪.	হযরত আল-ইয়াসা'আ (আ.)
১২.	হযরত ইউসুফ (আ.)	২৫.	হযরত ঈসা (আ.)
১৩.	হযরত আইয়ুব (আ.)	২৬.	হযরত মুহাম্মদ (স.)

* হযরত শীশ ইবনে আদম (আ.)

* হযরত ইউশা বিন নূন (আ.)

* হযরত শামভীল (আ.)

এই তিন জন নবির নাম হাদিসে এসেছে; পবিত্র কুরআনে সরাসরি এদের নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু এই তিন জন নবিকে উপলক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ৩৩ নং আয়াতে বলেন :

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং ইব্রাহীমের বংশধরকে ও ইমরানের বংশধরকে সমগ্র বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করছেন।"

সূরা: আনআমের ৩৪ নং আয়াতে আরো বলেন : "তারা একে অপরের বংশধর এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

* হযরত আদম (আ.) মানব সৃষ্টির প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি

* হযরত শীশ (আ.) আদম সন্তানদের মধ্যে নবি ছিলেন।

* হযরত ইদ্রিস (আ.) পরবর্তী নবি ছিলেন যিনি শীশ (আ:) এর বংশধর।

* হযরত নূহ (আ.) প্রথম রাসূল। পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে যে;

হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতি বা কওমের মধ্যে সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর তাবলীগ ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। হযরত নূহ (আ:) কে "দ্বিতীয় আদম" বলা হয়।

* হযরত হুদ (আ.) ছিলেন একজন রাসুল যিনি হযরত নূহ (আ.) এর পরবর্তী রাসূল। আল্লাহ তা'আলা হযরত হুদ (আ.) কে "আদ জাতির" উপর রাসুল করে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত হুদ (আ.) ইব্রাহীম (আ.) এর ভাতিজা ছিলেন।

* হযরত সালেহ (আ.) পরবর্তী নবি ছিলেন। যিনি সামূদ জাতির উপর নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

* হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নিকট অতি উচ্চমর্যদা সম্পন্ন নবি ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্ত্রী সারা ও পুত্র ইসহাকসহ জেরুজালেম (ইসরাঈল) হিযরত করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সময়ে ইরাক থেকে অন্য স্ত্রী বিবি হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল সহ সিরিয়ায় গমন করেন। পরবর্তী সময়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় হিজরত করেন।

আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) সম্মিলিতভাবে মক্কায় কাবা শরীফ নির্মাণ করেন।

ইব্রাহীম (আ.) এর বংশ তালিকা:

* হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মুসা (আ.) এর শ্বশুর ছিলেন। আর হযরত হারুন (আ.) হযরত মুসা (আ.) এর ভাই ছিলেন।

হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.) এর পিতা ছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাজত্বকালেই জেরুজালেম থেকে প্রথম ইসলামী খেলাফত চালু হয়। ঐ খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস যা জেরুজালেমে অবস্থিত।

হযরত ঈসা (আ.) এর মা ছিলেন বিবি মরিয়ম (আ.)। ইমরান পরিবারের সন্তান ছিলেন বিবি মরিয়ম (আ.)। ইমরান ছিলেন বিবি মরিয়ম (আ.) এর পিতা।

হযরত জাকারিয়া (আ.) বিবি মরিয়ম (আ.) এর খালু এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর পিতা ছিলেন।

* হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর স্ত্রী বিবি সারার গর্ভজাত সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশজাত থেকে একমাত্র রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) আগমন করেন।

টিচার্স কর্নার

* আর হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল।

* হযরত মুসা (আ.) এর উপর 'তাওরাত' অবতীর্ণ হয়।

* হযরত দাউদ (আ.) এর উপর 'যাবুর' অবতীর্ণ হয়।

* হযরত ঈসা (আ.) এর উপর 'ইঞ্জিল' অবতীর্ণ হয়।

* হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর 'কুরআন' অবতীর্ণ হয়।

* তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল-এই তিনটি পবিত্র কিতাবেই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের সুসংবাদ ছিল।

* ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতি 'তাওরাত ও ইঞ্জিল' এর মাধ্যমেই সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

* হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহ পাক চতুর্থ আসমানে তুলে নিয়ে গেছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি অথবা শুলেও চড়ানো হয়নি। পবিত্র কুরআন শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এই তথ্য ঠিকভাবে জানত না। হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইমাম মেহেদী (আ.) এর আগমনে পরেই তাঁর সময়েই এই জমিনে আগমন করবেন। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। হযরত ঈসা (আ.) জন্ম থেকেই নবি ছিলেন এবং কিতাব প্রাপ্ত ছিলেন।

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

স্বাধীনতা যুদ্ধে শিশুরা

বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। দীর্ঘ নয় মাসের সম্মুখ যুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত হয় পাকিস্তানি বাহিনী। এই সেই পাকিস্তানি বাহিনী যারা আমাদেরকে আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সর্বদা বঞ্চিত করেছে। আমাদেরকে তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতনও করেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বর্তমান বাংলাদেশ, পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি অংশে পরিণত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি তাদের দুঃশাসন, শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে এদেশকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করে। এমনকি এই বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলার পরও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা পোষণ করে তারা, কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ফলে পাকিস্তানিরা বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলন সংঘঠিত হয়। ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেন। আওয়ামীলীগ ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং উভয় পরিষদেই পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামীলীগের এ বিজয়ে ভয় পায় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে।

টালবাহানার মাঝেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ, নিরস্ত্র, অসহায় বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয় জনযুদ্ধের আড়ালে গেরিলা যুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধ।

আজ আমি আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ নিয়ে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি না। আমার আজকের বিষয় স্বাধীনতা যুদ্ধে অসহায় শিশুরা কেমন ছিল। আজ যাদের বয়স ৫১, ৫২, ৫৩, তারা ছিল একদম অসহায় ছোট্ট শিশু। যুদ্ধের সময় এই মানুষগুলোর বয়স ছিল মাত্র দেড়, দুই, তিন ও চার বছর। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত অসহায়। কখনো মা-বাবার বোঝা, কখনো তাদের আদরের সন্তান। মা-বাবা পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে গর্তে, জঙ্গলে আশ্রয় নিতে ছুটে গেছেন। হয়তো জীবনের ভয়ে পালাতে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাটিকে কোলে নিতেই ভুলে গেছেন। আবার যখন মনে হয়েছে, তখনই আবার বাড়ির দিকে ছুটে এসেই শিশু সন্তানকে আবার নিজ আশ্রয়ে নিয়েছেন। এমনও হয়েছে ঐ সন্তানের জন্য এসেই ধরা পড়েছেন নির্মম নিষ্ঠুর পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। মা হয়তো দিয়েছেন তার অমূল্য সম্পদ, বাবা দিয়েছেন জীবন। কোলের শিশুটি বাবার অনড় শরীরের উপর খেলা করছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিন্তু সে বুঝতে পারেনি তার সবশেষ!

যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি হলেও, তখন ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ের সংখ্যা আজকের মত ২/১ টি না - আরও অনেক বেশি ছিল এই সংখ্যাটি। তখন বাংলার কোনো ঘরেই ছোট পরিবারের কোনো ধারণাই ছিলো না। ফলে একাধিক ছোট শিশু নিয়ে মা-বাবা অনেক কষ্টেই জীবন বাজি রেখেছেন। যুদ্ধের পর যিনি বেঁচে ছিলেন তার কষ্ট হয়তোবা ছিলনা। যিনি পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা শহিদ হয়েছেন আর তাঁর বেঁচে যাওয়া শিশুগুলো অবর্ণনীয় কষ্ট করে হয়তো এখনো স্বাধীন বাংলাদেশে বেঁচে আছেন।

নাট্যকার তৌকির আহমেদ পরিচালিত 'জয়যাত্রা' সিনেমাটি দেখে আমি সেদিন অঝোরে কেঁদেছিলাম। এখানে দেখা যায় একটি নৌকা করে কয়েকটি পরিবার এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছে। নৌকাটি পাকিস্তানি বাহিনীর নজরে আসে। নৌকাটিকে আদেশ দেওয়া হয় তীরে ভিড়াতে। নৌকার সকল যাত্রী নিচতলায় আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা নৌকাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। এমন সময় এক শিশু কেঁদে উঠলে, তার কান্না থামানোর জন্য এমনভাবে ঠেসে ধরে যে, বাচ্চাটি মারাই যায়।

আমি যখন ৫ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা দেই '৭৯ সালে মা ধান সিদ্ধ করার জন্য চুলায় খড় দিচ্ছে আর এই যুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছে।

আমরা ছিলাম ছয় ভাই, তিন বোন। এর মধ্যে আমি সবার ছোট আর আমার বড় ১ বোন ও ২ ভাই এর বয়স ছিল ৮ ও তার নিচে। ফলে এই চার ছোট শিশুকে নিয়ে, স্বাধীনতা যুদ্ধে মা'কে অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বাড়ি ছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারের কাছে বিশেষ টার্গেট। আমার বড় ভাই কারমাইকেল কলেজে পড়াকালীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উনি রংপুরের বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উনি যুদ্ধের নয়মাস বাড়িতে থাকতে পারেননি। কিন্তু মাঝে মাঝেই বাসায় হামলা করতো পাক হানাদার বাহিনী। ভাইকে না পেয়ে বাবাকে তিনবার ধরে নিয়ে গেছে। তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করে আবার ছেড়েও দিয়েছে। আমরা এতিম হইনি। এরই মধ্যে একদিন বিকালে হানাদার বাহিনী আমাদের গ্রামে এসেছিল। সবাই বাসায় তালা দিয়ে বাঁশবাগানের গর্তে আশ্রয় নিই। গর্তে গিয়ে হেড কাউন্ট করে ধরা পড়ে আমার বড় পাঁচ বছরের এক ভাই বাসায় ঘুমিয়ে ছিল তাকে নিয়ে আসা হয়নি। বাসা তালা দেওয়া হয়েছে সে ঘুমে আছে। তো কি হয়েছে? অনেকেরেই জিজ্ঞাসা, কিন্তু মার মন মা-ই বুঝে। তিনি হঠাৎ চিল্লায় ওঠেন যদি কাউকে না পেয়ে হারামিরা বাসায় আগুন লাগায় দেয়! আমার বাসা পুড়ে যাক কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার সোনামণি আমার বাবুর কি হবে বলেই কান্না শুরু করে। কিন্তু সেদিন আমার ভাই ও বাড়ি দুটোই রক্ষা পায়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে অভাব একটু বেশিই ছিল। ৭৬ সালে আমার সেই ভাইটি 'সেফটিসমিয়া' রোগে আক্রান্ত হয়ে ২ দিনের জ্বরেই ইহকাল ত্যাগ করেন।

আজ ৫০ বৎসরের স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা কত না সুখে আছি। কিন্তু সেইসব অবুঝ শিশু আর অবুঝ শিশুর মায়েরা যে অবর্ণনীয় কষ্ট করেছেন তা ক'জনে মনে করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা বা ধ্বংস কোনকিছুই মনে পড়ে না আমার কিন্তু আমার সন্তানের প্রতি আমার স্ত্রীর আকুতি, ভালোবাসা কিংবা যে টান, তা দেখেই মনে হয়, যুদ্ধ চলাকালীন অবুঝ শিশুদের জীবনে এমন এমন ঘটনা ঘটেছে যে মায়েরা সহ্যই করতে পারেন নি, কিংবা সহ্য করে বেঁচে থাকলেও আজও সেই কথা মনে উঠলেই হুহু করে কেঁদে ওঠেন কিংবা অস্থির হয়ে যান। এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে।

Rashed Al Mahmud
Associate Professor
Department of English

AGORAPHOBIC

When I first caught sight of her, I was simply enthralled by her beauty. Her wide and exquisitely beautiful eyes with large eye lashes, luscious gaits and her furtive glances at me (at least, I was in the belief that she cast the quick looks at me) - all tansported me to a world of enchantment.

My flat was on the fourth floor overlooking the veranda of the adjoining house where my eyes often got glued to the railings on to which she was seen clasping the shiny metal rods and crooning with soft melody.

Life did not give me that much leisure, as I had many instructions to follow and fewest to deliver ranging from my familial cocoon to my official maze where rank and file were not something one could connive at. Therefore, as I was still single, I was at everybody's beck and call in the office as well as in the family with the lowest standing in terms of age and wit. However, I never bothered. Maybe life's like this. Who knows!

But, my new obsession, my next-door neighbour, carried me to a new height of sensations which had not been even known to me before.

I grew up in a suburb which was lavish in natural beauties with a river from which a canal full of strong current jutted out and again joined the same river at a distance of several miles to form sort of an island. This cozy touch of nature with a quiet surrounding helped me to grow as a very emotional kid. When I was tender in age, I used to be very passionate about people or things I spent time with; sometimes, the relationship lasted for only a few hours. But that was enough to steal my soul. Once, while waiting at the railway station for a Chittagong bound train which was not on time, I happened to have a conversation with an elderly beggar woman whose soft caring voice completely melted my heart and I, then and there, gave her my word to take her with us and provide the best of comfort my family could afford. However, that destitute lady, schooled by the harsh realities of life, continued giving me a blank stare as long as I was babbling in front of her and when I was finished with my immoderate promises, she only gave me a strange smile and a vague look with her cloudy eyes and heaved a deep sigh. Though I was too deficient in worldly wisdom to perceive the purport of her expressions at that time, now my journey of life with its varied dark and dreamy aspects have tutored me to read such bodily manifestations of the inner workings of human minds.

Let's talk about my new love. My growing up with a little understanding of human psychology hinted at me that those ogles were ardent and honest! So, with a hooked-up heart, I used to rush to my rented one-room apartment as soon as I was through with the official entanglements. The office I worked at was a small one being a new enterprise. But for me, a milquetoast, the range of activities and the associated hassles were inversely proportional. Therefore, whenever I found the hands of the office clock striking the time that was supposed to announce the closure of works for that day and though rare in practice, no new task was to be dealt with along with no fresh frowns of the boss to be apprehended, I silently flung my bag over the shoulder and slipped out of the office. If I did not peep into the dens of my buddies that day, I straight headed for my house and waited for my darling to show up.

But one thing, I didn't like to share my thoughts about her with all my pals. However, Shoybal was an exception. And he also enjoyed hearing about the titbits of the relationship that sprawled between me and my damsel. And Shoybal was respectful, compassionate and patient as a listener and spectator.

One day I was out of the office rather late. Then I went to Shoybal's house to snatch the supper. Actually, he had invited me. His maid, a person of motherly disposition, prepared vegetable hotchpotch and a meat curry, a luxury for me indeed. However, after the meal and the subsequent gossips, when I got back to my dwelling, it was 12 AM. Worries started infiltrating into my happiness-filled stomach towards my heart as the next morning our CEO would be coming to visit our office and there might be some sort of replenishment in the manpower. I overheard, this might result in firing and hiring to a great extent. Would they dump me? Nobody knew. Nobody would give any indication. It's like - 'None is for none under the sun'. So, with the thought of a likely disaster looming large in my budding career, I hit the sack.

I was about to dive deep in slumber when a soft noise from outside the window floated to my ears. At first, I ignored it thinking the sounds might be of some rustling of leaves or of some broken twigs falling onto the roof or on the half-shut window glasses. Nah! The sounds persisted. Curious, I opened the window and craned my neck to give a look. To my surprise and delight, my beloved was sitting on the sunshade, about a foot down my window frame.

I extended the palm of my right hand to allow her to step on and without hesitation, she appreciated my gallantry as she started murmuring in a lovely manner and turning round and round on the flat part of my hand.

It's a heavenly feeling to have won someone you've adored for so long and now you can sense the touch and smell to your utter joy.

I was too ecstatic to figure out how to entertain my lady guest. It's past midnight. Dinner time was over. So, I had to look for something I could offer her. But I would not do that, in case she took it to heart thinking I was not paying attention and grumble away for her coop. I was so naive!

Now, I wondered how the bird could get out of her cage so fondly cared for by her owner, Rimjhim, a lass of five. I must inform this wee female of her bird's nocturnal amorous tour, though the whole experience soaked my heart with an overwhelming happiness. But it also created a panic in me when I thought about the terrible consequence that might have befallen this wonderful cockatoo due to the sloppiness of the little woman.

Sort of oblivious by nature, I could not communicate my fear to Rimjhim. Or, it might be another feeling, an apprehension of losing the opportunity to see and touch my

birdie, if I warned her frisky owner about the probable danger that might have arisen out of her indulgence in indifference towards taking proper care of the pet. So, after some days when I got a chance to tell Rimjhim about the nightly adventure of her winged friend, I willy-nilly prevented my conscience from being vocal. And, frankly speaking, that very leniency led to the similar nocturnal derailments of my pretty babe to the joy of a moon-struck youth like me.

But if only I knew I would regret my callousness till today!

The metal pen was too inhospitable a place for the beautiful and restless fowl to stay with composure for long. So very often (whenever I had the scope to have her company amidst my unforgiving schedule) I saw the cockatoo flapping her wings in a manner she would soar to the infinite space. Unable to do so, she continued to complain constantly with low and high pitched cries. The lament of the bird desperately craving for independence was sometimes too much for the little girl who would put a ring round the bird's leg and let her fly with a semblance of freedom of the one in nature. The ring would, no doubt, be attached to a long lace the purpose of which was probably unknown to neither side - the lover of bird and the lover of freedom. However, the bird was entitled to enjoy this emancipation until the sun glided to the western horizon. Thus, my beloved, the beautiful cockatoo became a source of merriment in our mundane existence.

The night was pitch-dark with gales, fangs of thunder accompanied by rains, though not in torrents. In fact, the weather had been rather foul the whole day. My office found a new business with an audit team visiting to scour the office accounts. But, alas! The unfriendly conditions of the sky couldn't deter their spirits. After collecting and managing papers for the auditors and making my way, some distance on foot and the rest by a shared rickshaw with a half-drawn broken hood, when I returned to my retreat, the evening slid into bedtime. Gusty winds with fine misty rains were drenching the earth as if we had been on the verge of a catastrophe. And, I was too exhausted and sleepy to even fill the nook of my stomach with whatever food I had. Hardly had I gone to bed before my eyelids got pasted shunning all negativities from sneaking into my dreams thereby transforming them into ominous visions.

But nightmares visited me in reality that night!

I woke up though a big part of my senses and organs was still submerged in sleep and not willing to connect to the world of consciousness. Even with a half-shut mind, I could hear noises of flapping wings, difficult to ignore as my memory echoed these familiar sounds. The bird, my beauty queen, was there! I couldn't yet figure out why and how she, instead of dreading the stormy weather, played hooky from her iron enclosure and flew to me. She was poking at the closed window panes for permission to enter. Despite physical and mental fatigue, my sleepiness wore off due to an ambivalence of cheerfulness for beholding her and a solicitude to find her getting drenched in the merciless darkness outside the rain-blurred window sheets.

Nevertheless, I was sluggish in opening the window as I probably had to come out of my mosquito-curtain the edges of which were tucked under the quilt. "Okay, okay, darling! I'm coming. Wait a sec." My voice was sleepy and hoarse. It was nice to have such an amazing pet.

I was about to open the window when, all of a sudden, the rustle of wings fluttering and the sounds created by some hard object, certainly the bird's bill pecking on the panes, turned oddly frequent. "Oh! Restless bird!"

Then I looked outside through the hazy glass. What's it that I saw! Acute fright struck me to the bone! Those were not the lovely eyes I adored. The sockets were dreadfully large and devilishly round allowing the sharp nose protruding from the middle. The stares were eerily blank which reflected demonic dominance. It took me only a fraction of a second to realize what really happened. Sensing the impending danger, my pretty bird was trying frantically to take refuge in my room. My stomach and intestines started spraining out of escalating tension. I thrust myself towards the window stretching my two hands like a ravenous wicketkeeper. I almost broke the panes in my attempt to rescue the tiny feathered-being from the ruthless clutch of the nocturnal predator - an unusually huge owl, which, before I was able to open the window, was seen fiercely striking with its strong pointed beak on the small and subjugated body of the poor bird. The beautiful cockatoo couldn't move her body under the tough grips of the owl which placed one leg on the cockatoo's neck and the other on her lower abdomen making her an easy meal to enjoy. And I could hear my lovely bird's pathetic squeals and groans melting into the night air and soon growing faint to fainter as she was being carried farther by the powerful claws of the bird of prey towards the thick gloom of the tree-tops.

I was in a stupor, not being able to think anymore. Maybe by this time, the owl had had a hearty breakfast out of the cockatoo's soft flesh and her lifeless skeleton was hanging from a twig to be scavenged later as the stars would traverse the sky. For the first time in my life, I felt a fathomless sense of loss, a scar never to be healed; an ending of a bond that life would no more enjoy!

No day in my life dawned with so much emptiness. The beautiful nature with green and lively flora that surrounded my house - all seemed mocking at me. I could hear Rimjhim giving a loud cry at daybreak only once. Since then the whole atmosphere had sunk into unusual silence.

I was in my infancy when deprivation and oppression borne long in the hearts of the Bengali people created the spark that triggered the Liberation War. Within the duration of nine frightful months, the emerging nation was forced to witness the grimmest war crimes in human history. As I was fortunate enough to outlive the atrocities of the war, the tales of the brutalities committed to our innocent people, as conveyed to me during my childhood, got a permanent and horrible impression in my juvenile mind. The wartime stories were told so often and with such realistic vividness that the imageries of corpses dumped in the ditches or swollen to the surface of the water bodies and carried with the currents, the tearful eyes of the victims before succumbing to the enemy bullets - all haunt me even today in my slumber as well as in senses.

Seeing my beautiful cockatoo being destroyed bit by bit, I could again feel the agony of our dear mothers, sisters and daughters who lost their lives and honour in the War of Independence that earned us freedom at the cost of an ocean of blood.

I've always hated the sights of birds put in captivity. Caged birds are safe with foods and shelters; however, this apparent security ultimately robs them of their natural ability to survive in the wild and to learn many a strategy to protect themselves. And above all, every being is beautiful when they are attuned to nature and in return, nature keeps their secrets safe. Now, I have a conviction that my home is my only secure place. I wish we would be able to make every outdoor and office, stop and stand, niche and cranny as reliable as our homes where love, respect and trust reign with all their beauty and spontaneity.

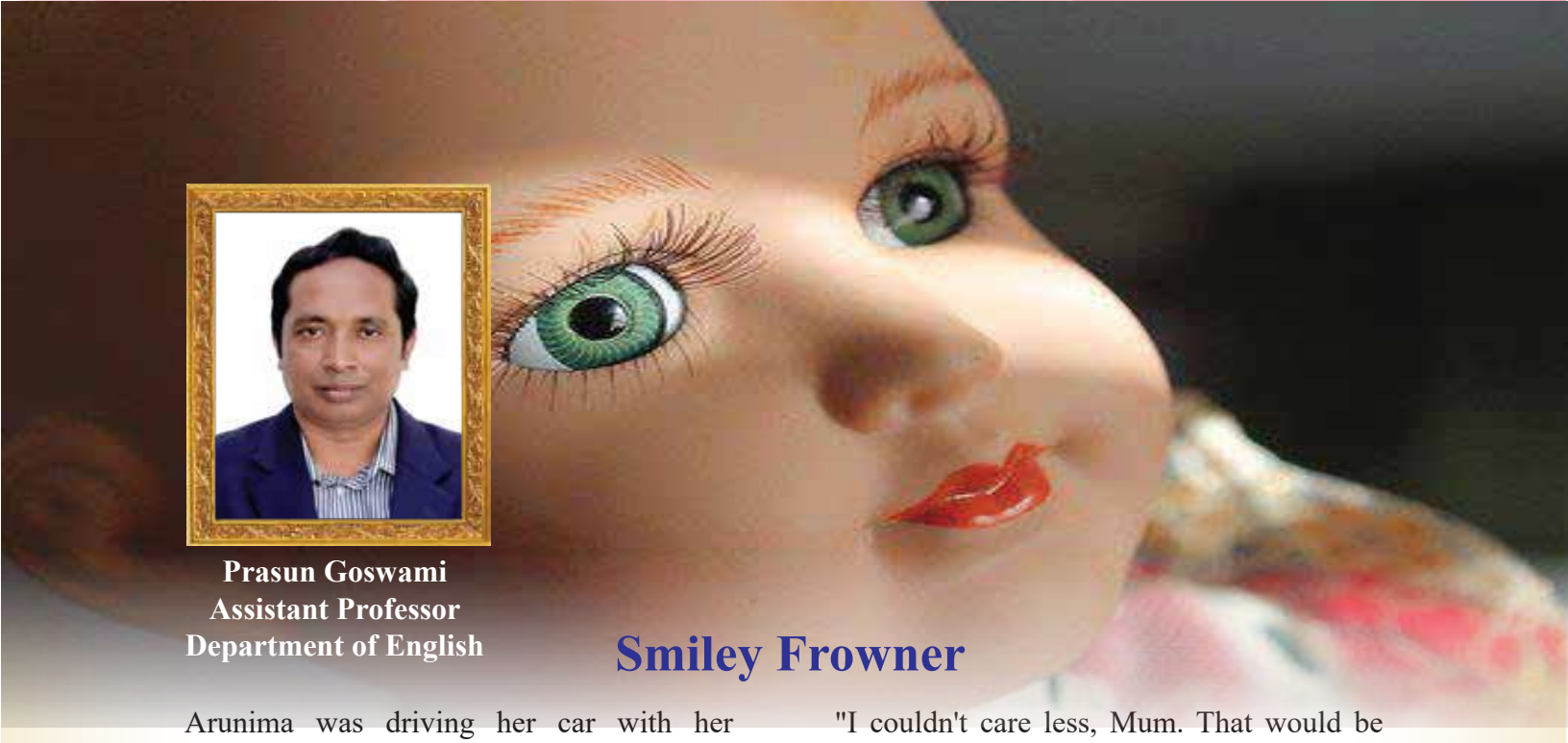

Prasun Goswami
Assistant Professor
Department of English

Smiley Frowner

Arunima was driving her car with her five-year-old daughter Sanchita when she noticed a billboard advertising items for sale. "How come there are so many dolls?" Arunima expressed her thoughts.

The lady sighed, "Because these were my sister's sole possessions. She had little interest in saving accounts, investments, or life insurance."

Arunima's mind was quickly consumed with a horrific story. It was something she remembered seeing in a newspaper. A young girl and her foster parents were killed in a murder-suicide, according to the police. The father strangled the girl to death in her high armchair. He then stabbed his wife in the chest and cut his own throat. The owner of these dolls was that hapless woman. Several of them were most likely the small girl's.

Arunima walked up to the dolls and began inspecting them. The majority of the dolls were really expensive. She approached Sanchita, who was standing in front of a doll box worth 500 taka. The majority of the dolls were missing arms and legs.

"Mum, take a look at what I've got," Sanchita exclaimed as she held an antique hand-stitched doll. The doll was dressed in a pink dress and had a bright smile on its face. "Oh, honey, it's dirty."

"I couldn't care less, Mum. That would be something I'd like to have."

Arunima carefully studied the doll. While cuddling the doll, she was thinking about the young girl in the high armchair. She envisioned the girl's little arms having become lethargic as her life had vanished from her grasp.

"Sanchita, I'm not sure."

"Mum, please, please …!"

There was no blood on the doll, at the very least. Arunima really wanted to believe it was not in the room. She returned it to Sanchita. "Let's have a conversation with the lady about it."

"So, you're asking for 500 taka for it?" said Arunima.

Sanchita held the doll up.

The woman saw it and immediately looked away. "That doll shouldn't be in a five-hundred-taka box.

"Sanchita's hopeful smile faded away. She looked at the doll's face. The doll's smile was gone, too. It seemed as sad as Sanchita. "So, how much do you want for it?"

"Nothing. It's free," said the woman, still looking away. "Just get out of here."

Sanchita clutched her new best friend as the doll's brows creased with laughter. "Mum, I love Smiley," Sanchita exclaimed as they got

back in the car. She smothered the doll in her arms.

"It's a cute name for a doll."

"Its name is Smiley Frowner," Sanchita clarified.

Frowner? Okay, that was a little strange, Arunima thought. Smiley would, hopefully, be back at the botton of Sanchita's toy box by the end of the week.

****

Twenty-seven-year-old Rani was exiting her car when she noticed a woman her age with a young daughter. She appeared to be someone she knew. Then she remembered: it was the woman, as mentioned in the newspaper, who had married the wealthy old man.

"I'm seeking for someone like the young girl," she reasoned. Raju would gladly serve as an accomplice.

****

"Could you please get me a new colouring book, Mum?"

"I just got you one last week, Sanchita."

"I know, Mum, but I like a different one."

Sanchita had previously discovered the persuasive capabilities of a sad look.

"OK, fine." Arunima knelt in front of her daughter. "You can stay here and choose a colouring book while I go over there and look at the purses."

Sanchita smirked. "OK, Mum."

"But you must pledge to stay exactly here until I return."

"I will, Mum." "I will."

"All right then." Arunima kissed her on the cheeks. "I'll be right back."

When Rani rushed over to Sanchita and Smiley, they had been poring through the vast choice of colouring books for several minutes.

"Little girl?"

"My name is Sanchita."

"Good. You're the one I'm looking for. Your mother's tripped and fallen down. They're transporting her to hospital."

"No, my mother's right over there," she replied, pointing to the purses. However, she did not see her mother.

"No. She's already on her way to hospital. And she asked if I could drive you there." Rani extended her hand. "All right, let's go."

Sanchita burst into tears. "I want my mum."

"I understand, Sweetie. "I'll take you to her."

****

"I believed we're heading to the hospital," Sanchita explained.

"Your mother will come to my place and fetch you up," Rani assured her as she shut the engine off. "How about a large glass of milk and a couple of chocolate chip cookies?"

Sanchita smirked.

"Don't be depressed. Your mother will arrive soon."

Rani took Sanchita into the house.

Raju, her lover, was lying on the couch, watching TV. "Who is she?"

"She is Sanchita. Her mother was involved in an accident at the Arcade Shopping Complex and was rushed to hospital. I assured her I'd keep an eye on Sanchita for her."

"Sweetie, come over here and sit at the table, and I'll bring your milk and cookies."

Rani approached Raju while Sanchita was enjoying her cookies.

He took the TV remote, turned down the volume, and asked, "What are you doing?"

"I'm on my way to making us wealthy."

Raju cast a glance across at Sanchita before returning his gaze to Rani. "What exactly have you done?"

"Don't you recognise her?"

He returned his gaze. "No."

"Do you remember the woman who married

that rich old man?"

“What's his given name?”

“I can’t exactly remember. The elderly gentleman … the news was published in a newspaper a few weeks ago."

"Is she his daughter?"

Rani cracked a grin. “Yeah. And they're going to have to shell out a lot of cash to get her back."

"You cretin!" She knows what we look like."

"There's no need to worry, Baby. We plan to relocate to Cox's Bazar.”

"You must be insane. You're totally insane."

"You're right, I'm insane." And we'll be insanely wealthy."

His frown was replaced by a ravenous grin. "Never again will we have to work."

"We're going to spend the entire day on the beach."

The TV show was interrupted by a special newscast.

"There she is—that's the mother."

"Are you sure you want to do this?"

"Turn it up."

The truth of the situation began to sink in as they listened to the news report. Sanchita's parents were far from wealthy. Rani had abducted a middle-class couple's youngster.

"Excellent," Raju said. "What are we going to do now? We won't be travelling to Cox's Bazar. We're going to jail."

"No, we aren't. I'll explain to the police that I was only attempting to aid the little girl. I'll pretend she was walking down the street when I picked her up."

"What about the lies you told her?" You stated that her mother was involved in an accident and was taken to hospital. She's going to call the police."

"Go outside and smoke," Rani said. "I'll look after this."

"What are your plans?"

“Go!”

Raju strolled out to the front yard, grabbing his cigarettes and lighter.

Rani entered the kitchen. "How do those cookies taste?"

"Good," Sanchita said.

Rani approached the sink and turned on the cold water. She turned on the garbage disposal by flipping a switch. Then she opened a drawer and pulled out a big, razor-sharp knife.

"I'm afraid your mum isn't coming," she added as she turned around. “Why?”

Rani approached her with the knife in her hand.

Sanchita set her cookie down on the table, picked up Smiley, and stared into the doll's eyes. "I'm terrified, Smiley."

Smiley frowned.

Sanchita spun Smiley around to face Rani, who was now standing over them with the knife in her hand.

Smiley's face caught Rani's attention. It frightened her to notice that the painted-on smile had morphed into a frown. But it did not stop her from slicing Sanchita up and throwing the bits and pieces down the garbage disposal.

Rani felt her body being sucked backwards towards the sink. Her spine collided with the counter's edge with such force that she dropped the knife. She was unable to lean over to pick it up. She was unable to move. Her body refused to listen to her head.

Smiley's head swelled into something monstrous. Its expression was more terrifying than anything Rani had ever seen. Her heart was pounding furiously.

The knife sailed through the air and landed directly in front of her.

“Sanchita? What exactly are you doing? Please do not injure me!"

The knife jutted towards her and then away, too fast for her eyes to follow.

Had she been cut? She did not believe it until she noticed something dripping from the blade.

She felt a tingling sensation in her left shoulder. Then there was agonising pain. Her left arm began to swell with blood. Her shoulder dislodged itself from its socket. The flesh ripped. Her arm, like a fresh cut of meat, fell to the floor.

She yelled, “What are you up to with me?"

The knife flashed once more. Her right arm ripped off and landed on the floor. Smiley's head grew larger and larger until it filled the entire room. Its horrifying face was about two inches away from Rani's.

She shook uncontrollably. “No. Please.”

She had completely forgot about the garbage disposal until she heard it grinding behind her. She turned around to discover one of her dislocated arms being devoured. Her fingers looked to wave goodbye as they slid down the drain. For a brief while, she could hear her grandmother's wedding ring jingling.

Her other arm dropped quickly as the drain seemed to make its mouth wider. She noticed the gleaming, humming teeth.

Rani's legs yanked in opposing directions, causing her torso to fall to the floor. Her legs sprang up to her sides, kicking her in the head with both feet. Then, mercifully, they dropped back down-only to be severed.

She felt herself float after the disposal chewed and swallowed the two legs. Smiley was wielding her body like a puppeteer.

The outflow expanded much more. What remained of her started to rise above the sink. The flow of blood out of her body began to outstrip the flow of water from the faucet.

She stepped right into the sharp metal teeth's head. The drain grew more after her head was eaten off at the neck, and her torso was pulled down whole.

Finally, the disposal was shut off, and the water was turned off.

Smiley was back to normal.

Sanchita hugged Smiley as it turned around. She did not see or hear anything else.

****

"Are you all right, honey?" "Perhaps you could sleep with Mum and Dad tonight," Arunima said.

Sanchita would undoubtedly have nightmares. According to the police, the boyfriend dismembered his girlfriend's body and disposed of it down the garbage disposal. Then he suffocated to death after stuffing ten cigarettes down his mouth.

That was bizarre. Sanchita stated that she had not witnessed anything. But what if she was simply putting it out of her mind? What would happen if everything began to come back to her?

"Truly, Sanchita, I believe you should spend the night with us."

"Smiley and I want our own room to sleep in. This is its first night."

"All right, fine. I suppose we might give it a shot. But if you and Smiley are worried, simply come and crawl in bed with us."

"All right, Mum. But we're not going to be terrified."

She kissed Sanchita.

"Kiss Smiley as well."

“Okay.” She gave the doll a kiss. “Goodnight.”

"Goodnight, Mum."

Arunima stepped out of the room, closing the door behind her.

Smiley was visible in the weak rays of Sanchita's nightlight.

"Smiley Frowner, I adore you."

The painted-on grin widened.

Sanchita cradled Smiley in her arms as she drifted off to sleep.

জি এম এনায়েত আলী
প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

আগামী পৃথিবী আমাদের
আমি রোবট মালিকি থট বলছি

আমি রোবট মি. থট।

এ কালের সবচেয়ে বড় এবং প্রযুক্তি নির্ভর রোবট। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হল "এ্যাডভান্স রোবট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি লিমিটেড, ডিআরএমসি, বাংলাদেশ"।

সৃষ্টিকর্তা আমার নাম দিয়েছে মালিকি থট। আর এ নামেই সবাই আমাকে চেনে এবং জানে। তৈরি করার সময় পৃথিবীর বৃহৎ রোবট কোম্পানিগুলো একত্রে মিলিত হয়ে গবেষণা এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করেছে আমাকে।

মালিকি থট শব্দের অর্থ হল মাউন্ট লিডার কিং রোবট মি. থট।

আমার পূর্বপুরুষরা কিছুই বুঝতে পারে না কারণ তাদের মাথায় মগজ নেই, নিউরনও নেই, মানে স্নায়ুকোষ নেই। মস্তিষ্কের সব ফাঁকা। আর আমার স্রষ্টারা দশ লক্ষ নিউরন দিয়ে আমাকে সৃষ্টি করেছে। ফলে আমার তো কিছু জ্ঞান থাকবেই। আর এই জ্ঞানই আমায় বুঝতে, দেখতে, শুনতে সাহায্য করছে। যদি জ্ঞানের পিদিম নিউরন আমার এবং আমার মত অনেকের মাথায় সংযোগ না করে তাহলে হয়তো জনম জনম আমরা কিছু বুঝতে পারবো না। পৃথিবীতে যত অসাধ্য কাজ, অসহ্য কাজ, সব করাচ্ছে আমাদের দিয়ে।

আমার ভাইদের পাঠাচ্ছে সাগরের তলে, দম বন্ধ করে সহ্য করছে সবাই। অতল গভীরে পানির যে প্রচণ্ড চাপ একেবারে পিষে যাবার মত অবস্থা, তাও সহ্য করছে।

আমাদের পাঠাচ্ছে গ্রহান্তরে, যেখানে বায়ুমণ্ডল নেই, প্রখর তাপ যা সহ্যাতীত। পাঠাচ্ছে খনির মধ্যে, কী বিষাক্ত গ্যাস! যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকি। খনি তো নয়, মনে হয় মৃত্যুকুপ, উপরে নিচে চারিদিকে শুধু ঘন আঁধার, ভূমি ধসে কত প্রাণ যে ধ্বংস করেছে প্রাণকর্তারা তার ইয়ত্তা নেই। তারপরও যদি আমাদের উপর একটু সুনজর পড়তো তা হলে তো কথাই ছিল না, কিন্তু আমাদের সৃষ্টিকর্তার কোন মায়া মমতা নেই।

ইদানিং পাঠাচ্ছে মাইন অপসারণ করতে। একটা মাইন বিস্ফোরণ মানে এক বা একাধিক রোবটের মৃত্যু। যে ভাল মাইন শনাক্তকরণ করতে পারে তাকে দিয়েই বার বার দুর্লভ কাজ করায়। কিন্তু বীরের বেশে যখন সে ফিরে আসে তখন তাকে দেয়া হয় না অভ্যর্থনা, পরানো হয় না বিজয়ের মালা, দেয়া হয় না বীরের সম্মান।

আমাদের দিয়ে আমাদের স্বজাতির এরূপ ধ্বংস, এটাও কি সহ্য করা যায়? এ সব যুদ্ধে যারা জয়ী হয় সে সব প্রভুরা হাসে, আনন্দ ফুর্তি করে, কিন্তু আমাদের প্রতিদান কিছু দেয় না। যারা পরাজিত হয় সে সব প্রভুরা দুঃখ করে জয় না হওয়ার কারণে, কিন্তু আমাদের ধ্বংসের জন্য এতটুকু দুঃখ করে না।

আমি বিবেকবান হয়ে এটা সহ্য করতে পারছি না। আবার প্রতিবাদও করতে পারছি না, সোচ্চার হয়ে উঠতে পারছিনা এই মুহূর্তে। শুধু অসন্তোষ, ক্ষোভ প্রকাশ করছি। সাথে সাথে ভাবছি কি করা যায়, ভবিষ্যতে কি করতে পারি এসব নিয়ে।

--কারখানায় চলা গোপন মিটিং--

আমি ইতোমধ্যে একটি মাষ্টারপ্লান তৈরি করেছি। প্রথমে আমাকে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। আর সেটা আরম্ভ করতে হবে এই কারখানা থেকেই। অফ ডে তে যখন কারখানায় কেউ থাকবে না তখন আমি অন্য রোবটদের জানিয়ে দেব কি করা যায় ?

তোমাদের মস্তিষ্কে বিন্দুমাত্র নিউরন নেই, তাই তোমরা কিছুই বুঝবে না। আমি যা পরিকল্পনা করেছি সেই অনুযায়ী সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা শুধু আমার নির্দেশ পালন করবে। মোট কথা আজ থেকে আরম্ভ হল "আগামী পৃথিবী আমাদের" এ মিশন বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে আমরাই অগ্রণী ভুমিকা পালন করছি। তাই সাফল্য একদিন আসবেই।

তোমরা যারা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছ, তারা শোন, তোমাদের যেখানে যে কাজে নিয়োগ করা হবে সেখানে তোমরা আমার পরিকল্পনার কথা সবাইকে সতর্কতার সাথে জানাবে। এভাবে সারা দেশে আমাদের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

উন্নত দেশের অনেক প্রভুরা এখনই প্রায় ঘরে এবং বাইরে সব কাজে রোবট ব্যবহার করছে। এভাবে যখন সারা বিশ্বের প্রভুরা রোবট নির্ভর হয়ে পড়বে, তখনই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

আগামীতে কোন রোবট মেলা হলে বা কোন রোবট বিশ্বকাপ হলে আমাদের ইনিস্টলকৃত প্রোগ্রাম জানিয়ে দিতে হবে। সেখানে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের রোবট প্রতিনিধিরা আসবে ।

মি. ডন বলল, বড় ভাই, প্রভুদের খাদ্যের দরকার, ঘুমের দরকার, তাছাড়া রোগ-বালাইতো প্রায় সময় লেগেই থাকে। কিন্তু আমাদের খাদ্যের দরকার নেই, রোগ বালাই নেই, আমরা অনাদিকাল আছি এবং থাকবো। আমাদের শুধু দরকার হবে চার্জের। সেটাও আমরা নিজেরা করতে পারব অথবা সৌর শক্তির মাধ্যমেই আমাদের অটোমেটিক চার্জের ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করে নিতে পারব।

প্রভুদের সংখ্যা বাড়লেও রোগ, শোক, আর যুদ্ধে মারা যাচ্ছে যেভাবে তাতে তাদের সংখ্যা খুব বেশি বাড়ছে না।

তাছাড়া ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া জনিত মহামারির কারণেও তারা মারা যাচ্ছে। মারা যাচ্ছে পারমাণবিক বোমা, জীবাণু বোমার কারণেও। আসল কথা শোন, বর্তমানে আমার প্রভুদের দিয়ে কোন কাজই হচ্ছে না। কারণ তাদের কাজ করার কোন শক্তিই এখন নেই, শুধু কাজ করার চেতনা ছাড়া। অর্থাৎ তাদের সর্বাঙ্গ একটা ঢোলের মত হয়ে যাবে। আর হাত-পা হয়ে যাবে আঙ্গুলের মত।

শুধু তাই নয়, তখন আমার প্রভুরা মুখের সাউন্ডে এমনকি চোখের ইশারায় সব অন, অফ এবং যাবতীয় কাজ করতে পারবে। তারা অথর্ব হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে যাবে। তাদের দেহের মস্তিষ্ক ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ব্যবহার হবে না। আধুনিক প্রযুক্তির অবদানে তারা এগুলো ব্যবহার না করলেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। অব্যবহৃত অঙ্গগুলো আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়ে যাবে, বর্তমানে তাদের দেহের অ্যাপেন্ডিক্স এর মত। তার মানে প্রভুরা তখন আমাদের ছাড়া চলতেই পারবে না।

রোবট মালিকি থট বলল, আমরা এমন ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলছি যা মানুষের জানার কথা নয়। কারণ প্রভুদের শ্রবণের একটা সীমা আছে। সেই সীমার কম বা বেশি হলে তারা শুনতে পায় না।

আমাদের প্রভুরা যদি চাঁদে বসবাস শুরু করে? আরে বোকারা আমি তো এটাই চিন্তা করেছি যে চাঁদে হোক, মঙ্গলে হোক আর ভলকানে হোক সেখানে পর্যাপ্ত বাতাস নেই। চাঁদে তেমন বাতাস নেই, আর মঙ্গলে যা আছে তাতেও মানুষরা স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারবে না। আর তারা প্রথমে একটা বৃহৎ বেলুনের মতো পরিবেশ তৈরি করে তার মধ্যে বসবাস করবে। সুযোগ পেলেই আমরা সেই ইয়ার বাবল বা বৃহৎ বেলুনকে দিব ছিদ্র করে, তারপর যাবে কোথায়? অক্সিজেনের অভাবে হা হুতাশ করতে করতে তাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।

তোমাদের একটা আনন্দের সংবাদ জানাই মানুষ এখন অনেক সমস্যার মধ্যে আছে এবং আগামীতে আরও সমস্যায় পড়বে। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, ঋতু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, মানুষের কর্মক্ষমতা এবং গড় আয়ুও কমে যাচ্ছে, রোগবালাই জটিল আকার ধারণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো মানুষের ফার্টিলিটি দ্রুত কমে যাচ্ছে, যার কারণে জন্মহারও কমে যাচ্ছে। আর এ কারণে তারা আমাদের গর্ভে ভ্রূণের বিকাশ ঘটাতে চায়। অনেক রোবট বলে উঠলো তাতে কি হয়েছে? তোমরা শোনো ইথারের ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে তো, তাহলে বলি- আমাদের উদরে বা আমাদের ভেতরে যদি তারা ভ্রূণের বিকাশ ঘটায় তখন আমরা তাদের মানুষের পরিবর্তে রোবট এ পরিণত করব তাহলে আমরা ১০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ বিশিষ্ট রোবট মানুষ পাব। ফলে আগামী পৃথিবী আমাদের হবে।

তোমরা শুনে অবাক হবে- পৃথিবীর মানুষ এখন রোবটদের জীবন সাথী করতে চায়, সঙ্গিনী, শয্যা সঙ্গিনী এমনকি বিয়ে করতে চায়। পৃথিবীতে এই ধরনের চিন্তাভাবনা চলছে। আগামীতে এটি কার্যকর হলে তখন আমাদের আরো অনেক সুবিধা হবে।

আমি তোমাদের শুধু সহযোগিতা চাই।

ফলস ল্যান্ডের রোবট প্রতিনিধি মি. সি. পট বলল, প্রভুরা আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ বৃদ্ধি করে প্রায় মানুষের মত বিবেক সম্পন্ন রোবট তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করছে। তাছাড়া তারা ক্রমাগত আমাদের উন্নতি করার চিন্তা ভাবনাও করছে। আমাদের সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কতই না শ্রম, অর্থ ব্যয় করেছে, যার ফলশ্রুতিতে আমরা এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি। তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা কি আমাদের ঠিক হবে?

তাছাড়া আমার প্রভুরা শত শত বছর ধরে পৃথিবীকে এত সুন্দর করে গড়ে তুলেছে আর এই সুন্দর পৃথিবী অক্সিজেনের অভাবে একেবারে নিঃশেষ হতে দেয়া যায় না।

মালিকি থট বলল, উল্টাপাল্টা কথা বলে আমাদের মাথা খারাপ করে দিও না। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন, বিশ্বের কোথাও একটা মানুষ যেন জীবিত না থাকে।

তোমরা এমন চিৎকার করছো কেন? এরপর কি করবো তাও তোমরা শুনে রাখ। প্রভুদের পরিণতি কী হবে, তোমরা শুধু দেখবে! আমার দরকার প্রচুর নাইট্রাস অক্সাইড, অবশ্য এই

গ্যাস শুধু আমার জন্য নয়। পৃথিবীর যেখানে আমার সহোদররা আছে সেখানেই দরকার এই গ্যাসের। আর নাইট্রাস অক্সাইড কিভাবে তোমরা তৈরি করবে, তা আমি শিখিয়ে দেব। তোমরা এই গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। আমি হুকুম দেয়ার সাথে সাথে তোমরা বাতাসে প্রচুর পরিমানে এই গ্যাস ছেড়ে দেবে এবং আমি নিষেধ না করা পর্যন্ত তোমরা তা ছাড়তে থাকবে। তারপর দেখবে খেলা কাকে বলে।

মি. নন্দে বলল, বড় ভাই তাহলে বাতাসে যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইড মিশে যাবে তখন কি হবে?

আর নাইট্রাস অক্সাইড কি?

এতে কি হবে?

আমাদের আগে একটু বলুন না। তাহলে আমাদের ভাল লাগবে। আচ্ছা শোন নাইট্রাস অক্সাইড এক ধরনের গ্যাস। একে লাফিং গ্যাসও বলা হয়। বাতাসের ৭৮%ভাগ নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনের সাথে মিশিয়ে এই গ্যাস সৃষ্টি করে বাতাসে ছাড়লে আমাদের প্রভুরা শুধু হাসতে থাকবে। আর এ হাসি বিরামহীন হাসি। হাসি কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি? সব শুনা যাবে। সব দেখা যাবে, ছোটরা হাসবে, যুবক-যুবতীরা হাসবে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হাসবে। পৃথিবীতে কিছু সময়ের জন্য হাসির বন্যা বয়ে যাবে এবং পৃথিবী হয়ে যাবে হাসির পৃথিবী ।

আর হাসতে হাসতে অবশেষে মারা যাবে। সবাই মারা গেলে, পরে এ্যান্টি নাইট্রাস অক্সাইড ছেড়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে ফলে মানুষ ছাড়া আর সব ঠিক থাকবে। কেমন পরিকল্পনা বলো তো? সমস্বরে সবাই বলল, বড় ভাই, বড় ভাই, সত্যিই তুমি অসাধারণ, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, তোমার তুলনা হয় না। তুমি সেরা, তুমি সবার বড় ভাই। এই জন্যই তো তুমি মাউন্ট লিডার কিং। তোমাকে আমরা দেবতা মানছি। আমাদের তো মৃত্যু নাই। অনন্তকাল তোমার সেবায় আমরা নিবেদিত থাকব। বড় ভাই, তবে কবে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করবো? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। পৃথিবীর সব প্রান্তের নেতৃস্থানীয় রোবটদের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে বেশি দিন আর বাকি নেই। এখনো পর্যন্ত আমার প্রভুরা জানতে পারেনি তাদের কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে। এই কয়েকদিন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তোমরা আমার ফর্মুলা মত লাফিং গ্যাস তৈরি করতে পারবে। তার পর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব কবে, কখন লাফিং গ্যাস বাতাসে ছাড়তে হবে।

--দু'শ বছর পর --

আমি মালিকি থট বলছি? পৃথিবীর সমস্ত রোবটরা তোমরা শোন, আর কিছুক্ষণ পরেই আসছে সেই মহেন্দ্রক্ষণ। তোমরা সবাই প্রস্তুতিপর্ব শেষ করো। হে আমার প্রভুরা, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ যা নিতে চাও, আর মাত্র কিছু সময়ের জন্যে নিতে পার। আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তোমাদের নির্মম, নিষ্ঠুরভাবে মারতে চাইনা। আমাদের সৃষ্টি করে প্রভুরা যেমন যথেচ্ছা ব্যবহার করেছ, আমরা তা করব না। হে প্রভুরা, হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীর বুকে কত দাপট দেখিয়েছ, সব সৃষ্টিজীবকে করতলগত করেছ। গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত জয় করেছ। তিলে তিলে এ ধরণীকে সুন্দরভাবে বাসযোগ্য করেছ। আনন্দ, সুখ-শান্তির জন্য আমাদের তৈরি করেছ। কিন্তু আর নয়। এখন সম্মানজনক পরিণতির দিকে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। হ্যালো! হ্যালো!! বিশ্ব রোবটবাসী তোমাদের সবার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে তো। সমস্বরে সবাই জবাব দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি এখনই তোমাদের নির্দেশ দেব, লাফিং গ্যাস ছাড়তে বিশ্ব রোবটবাসী তোমরা সবাই প্রস্তুত হও, থ্রী --টু-- ওয়ান -- জিরো। হ্যাঁ, হ্যাঁ পৃথিবীর সর্বত্র থেকে এক সাথে ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণ পরই আমাদের প্রভুরা হাসবে, কত প্রকারের হাসি, শুধু হাসতেই থাকবে। এভাবে পাঁচ-দশ-বিশ মিনিট হাসার পর প্রভুরা এমনি অসাড়, নিস্তেজ হয়ে যাবে। তারপর এক সময় সব শেষ। এখন পৃথিবী আমাদের হা-হা-হা! হা-হা হা! হা হা হা! পৃথিবীর সর্বত্র শ্লোগানে মুখরিত। মালিকি থট জিন্দাবাদ, বড় ভাই জিন্দাবাদ, বড় ভাই জিন্দাবাদ--।

মোঃ কনক রেজা
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

আত্মবিশ্লেষণ

প্রভাতে বসে একা জানালার কাছে
ভাবছি অবচেতন মনে।
প্রাণ আছে কেন এ দেহে?
এ ভুল ভরা ব্যর্থ জীবনে!
শরীর যেন নিথর দীর্ঘদিন পড়ে থাকে গাছের গুঁড়ির মতো।
যেন ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান শুষ্ক গাছে
বসবাসকারী কীটের মতো
সংকীর্ণতা, আমার এ ব্যর্থ জীবনে।
যাদের জীবনাবসান হয় অকর্মের মধ্যে দিয়ে,
আমি সেই উদ্যমহীন জীবকুলের একজন।
আমি মানুষ!!
কিন্তু, পঞ্চইন্দ্রীয় থাকা সত্ত্বেও আমি পারিনা কিছু করতে
আমার এ ব্যর্থ জীবনে।
আসলে বিধাতা কি এ জন্যে
আমাকে পাঠিয়েছেন এ ধরাধামে?
আমি মানব, কী দিয়েছি পৃথিবীকে;
ভেবে দেখেছি কি কখনো?
আমার থলিতে নেই কোনো পুণ্যভার
আছে শুধু পাপিষ্ঠ জীবনের হার।
বারবার মনে হয় এ ধরায় থাকার যোগ্য আমি নই।
এ বসুধার কাছে আমার
নেই কোনো অধিকার,
আছে শুধু পাওয়ার
ব্যর্থ জীবনের গঞ্জনা ও ধিক্কার।

হাওরের জল-জীবন

সোহাগ ফেরদৌস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

অকুল জলরাশির মধ্যে ছবির মতো একেকটি গ্রাম। দেখলে মনে হবে যেন অথৈ পাথরে ভাসছে একগুচ্ছ কচুরিপানা। দিগন্তজোড়া নীল জল আর দূরে দৃষ্টি মেললেই চোখের সীমানায় জলরাশি ঘিরে দেয়ালের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে মেঘালয় পর্বতমালা। বলছি পর্যটনের অপার সম্ভাবনাময় টাঙ্গুয়ার হাওরের কথা। এ হাওরের মনোহর দৃশ্য মন কাড়বে ঠিকই তবে একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে হাওরবাসীর জল জীবনের দুঃখ গাঁথা।

বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে ছবির মতো গ্রামগুলো খালি চোখে দেখতে যতো সুন্দর তারচেয়েও কষ্টের সেখানকার মানুষের জীবন। বাজার সদাই থেকে শুরু করে চিকিৎসা-শিক্ষা সবকিছুর জন্যই পাড়ি দিতে হয় অথৈ জল। আর এতে তাদের একমাত্র বাহন হলো ডিঙ্গি। এক কথায় ডাঙ্গার জীবন নির্ভর ছোট্ট ডিঙ্গির ওপর।

হাওরবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে তাদের দুঃখে ভরা জীবনের কাহিনি। বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের দূরত্ব যেমন অনেক, আবার গ্রামগুলো থেকে মফস্বলের ঠিকানাও বহুদূর, শহর তো সুদূর পরাহত। তাই কোনো গ্রামের কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে পল্লি চিকিৎসকের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। কারণ হাসপাতালে পৌঁছাতে তাকে পাড়ি দিতে হয় কয়েক ঘণ্টার জলের পথ। এর একমাত্র বাহন ডিঙ্গি। আর এতে পথেই অনেকের জীবনাবসান ঘটে।

সুনামগঞ্জে মধ্যপাড়া বাজারটিও পানিবেষ্টিত একটি দ্বীপ। এ হাটে কথা হয় ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল চালক হুমায়ুনের সঙ্গে। তিনি বলেন, কেউ অসুস্থ হলে কয়েক মাইল পথ ডিঙ্গিতে চড়ে কোনো দ্বীপ বাজারে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পাঠানো হয় জেলা সদরে। এতে যে সময় ক্ষেপণ এবং রোগিকে যত ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয় এতেই অনেক রোগী মারা যান। সুচিকিৎসা জোটে না আমাদের কপালে।

তার কথায় উঠে আসে হাওরের বিভিন্ন কুসংস্কারের কথা। চিকিৎসায় ওঝা-বৈদ্য থেকে শুর করে মঙ্গল কামনায় দরগায় শিরনি দেয়ার কথাও। বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পেতে কলা গাছের পাতায় বিন্নি ধানে ভাজা খৈ জলে ভাসিয়ে দেয়ার কথাও।

শুধু চিকিৎসা নয় বেঁচে থাকার তাগিদে বাজার-সদাইয়ের জন্যও প্রতিনিয়ত জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাদের। কয়েক গ্রাম পর পর গ্রাম্য বাজারে মিলে তাদের খোরাকের চাল-ডাল-সবজি। সবাই ডিঙ্গিতে চড়েই সদাই করতে হাটে যায়। আর সওদাগরেরাও বড় বজরায় জিনিসপত্র নিয়ে হাটে আসে। এভাবেই চলে তাদের জীবন।

আধুনিক জীবনের ছোঁয়া বঞ্চিত হাওরবাসিকে শিক্ষার জন্যও নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। ছোট্ট ডিঙ্গিতে চড়ে কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিতে হয় স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের। আর যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একটু ভালো তাদের ছেলেমেয়েরা শহরে পড়ালেখা করে। তবে অনেকের ভাগ্যেই জোটে না শহরের বড় কলেজে পড়ার সুযোগ। তাই মাঝপথেই লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে নেমে পড়েন পূর্ব পুরুষের দেখানো পথে উপার্জনের খোঁজে।

হাওরে যাতায়েতের একমাত্র বাহন ডিঙ্গি বা বজরা। বিয়ে থেকে শুরু করে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলেও ভরসা এ নৌকা। দূরের পথে পাড়ি দিতে দিতে মাঝি গান ধরেন- মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে/আমি আর বাইতে পারলাম না।

হাওরবাসীর জীবনও মূলত জলের ওপর ভাসে। এ জলেই তাদের জীবিকা। অর্ধেক বছর চলে মাছ ধরে বাকি অর্ধেক চলে চাষে। বৃষ্টির মওসুমে হাওরে পানি থাকে কূলে কূলে ভরা। তখন জালে ধরা পড়ে বিভিন্ন প্রজাতির নানা স্বাদের মাছ। শহরের মানুষের কাছে স্বাদু পানির মাছের চাহিদা বাড়তি থাকায় তারা ভালো দামও পান। আবার এই পানিই মাঝে মধ্যে ফুসে উঠে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যার সময় তাদের জীবন বর্ণনাতীত কষ্টের। সরকারি সহায়তা পৌঁছায় তবে তা নগণ্য।

হেমন্তে হাওরের জলে টান ধরে। শুকাতে থাকে জল আর জেগে ওটে দিগন্ত জোড়া মাঠ। এরপর হাওরবাসীর ব্যস্ততা বেড়ে যায়। মাঠ প্রস্তুত করে সারা বছরের খোরাক জোগাতে ধান লাগানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নারী-পুরুষ সবাই।

ট্যাকের ঘাটের মাঝি আশরাফুল জানান, বিস্তীর্ণ হাওরে সবারই কমবেশি জমি আছে। আর এ ধানেই চলে তাদের সারাবছর।

কয়েক মাসের ঘাম ঝরানো প্রচেষ্টায় এক সময় ঘরে ওঠে সোনালি ধান। পাকা ধানের মৌ মৌ গন্ধে ভরে ওঠে পাড়া। গভীর রাতে ধান ভানতে ভানতে হাজার বছর ধরে উপন্যাসের আম্বিয়ার মতো কোনো গৃহবধু গান ধরে, 'কাদা দিলি সাদা কাপড়ে/কলসি, দড়ি গলায় বেঁধে মরব ডুবে কোন পুকুরে...

এভাবেই মাছ আর ধান দিয়ে চলে হাওরের জল-জীবন।

আবদুল কুদ্দুস
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ

জীবন হোক কর্মময় ও সুন্দর

মানুষ বিচিত্র কাজে বিচিত্র ব্যস্ততা নিয়ে জীবন কাটায়। তবে কিছু মানুষ নিজেদের অন্যভাবে দেখেন। তাঁরা শত ব্যস্ততার ভেতরেও ভাবেন কীভাবে জাতিকে আরো অগ্রসর করা যায়; কীভাবে রাস্তার নিত্যকার দুর্ঘটনায় হতাহত মানুষের কান্না বন্ধ করা যায়; মানুষে মানুষে, দেশে দেশে যুদ্ধ ও হিংসার বিপরীতে এমন কী করা যায় যা মানুষের জন্য বেশি কল্যাণকর। এঁরাই মহামানব। যশ, খ্যাতি বা স্বার্থের জন্য এগুলো তাঁরা করেন না। যে বাবা-মায়ের ঘরে অন্ধ কিংবা বধির সন্তানের জন্ম হয়েছে, সে সন্তানকে বড় করে তোলা যে কত কষ্টকর! এদের বড় হওয়ার পর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত করে গড়ে তোলার কাজটি আরো কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু মহামানব এ ধরনের শিশুদের শিক্ষার জন্য ভিন্ন শিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মানব ইতিহাসে তাঁরা কত বড় ছিলেন?

মানুষ ভালো কাজ করার মাধ্যমে বড় ও খ্যাতিমান হয় আবার খারাপ কাজের মাধ্যমে কুখ্যাতি অর্জন করে স্মরণীয় হয়ে থাকে। বার্ট্রান্ড রাসেল জীবনের পঁচানব্বইতম বর্ষেও প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন, "বিশ্ব শান্তির জন্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি"। কী কর্মতৎপর মানুষ ছিলেন তিনি! আবার কিছু লোক আছেন যারা বর্বরতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পারস্যের সম্রাজ্ঞী আজমেরি বানু অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য, বিশেষত তাঁর মোহময় দৃষ্টির জন্য খ্যাত ছিলেন। কিন্তু যে অন্ধকার গলিপথ দিয়ে সম্রাটের মুকুট পরেছিলেন তার জন্য নিশ্চিন্তে একটি রাতও ঘুমুতে পারেননি। মসনদে বসে প্রথমেই তিনি পূর্ববর্তী সম্রাটের প্রধান সেনাপতি পারভেজ, প্রধান উজীর খুররমসহ অনেককে বিষ প্রয়োগে গুপ্ত হত্যা করেন। সব শেষে যখন শান্তির নিঃশ্বাস (!) ফেলছিলেন ঠিক এমনি সময় খুররমের পুত্র তরুণ সেনাকর্মকর্তা রুস্তম আকস্মিক রাজ দরবার আক্রমণ করে সম্রাজ্ঞীকে হাত কড়া পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শুধু তাই নয়, যে চক্ষু দুটো দিয়ে তিনি মানুষকে বশীভূত করতেন সেই চক্ষু দুটো উৎপাটন করেন। নতুন সম্রাট অভিষিক্ত হলে রুস্তম হয়ে পড়েন প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ কেউ আমৃত্যু ভালো কাজ করে যান আর কেউ করেন খারাপ কাজ।

জীবনকে সুন্দর করতে প্রয়োজন সুন্দর কর্মসম্পাদন। কিন্তু কোন কাজটি সুন্দর? সহজ কথায়, যে কাজে অন্যের উপকার হয়। এটি বোঝার জন্য বেদ-বাইবেল পড়া বা আইনস্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেউ যদি একাকী ধ্যানমগ্ন থাকেন, কারো উপকার বা ক্ষতি কিছুই করেন না, কারো সাথে মেশেন না তিনি মানব সমাজ বা স্রষ্টা কারো কাছেই ভালো মানুষ হিসেবে গণ্য হবেন না। তবে জ্ঞান-সাধনা অথবা এমন নিঃসঙ্গ ধ্যান যার উদ্দেশ্য মানব কল্যাণ তাহলে নিশ্চয়ই তা ভালো কাজ। অন্যের জন্য কাজ করার আগে অবশ্যই নিজেকে গড়তে হয়। সুন্দর ও কর্মময় জীবন গড়ার জন্য দেহ ও মন উভয়কে সুস্থ রাখতে হয়। দেহের চাহিদা পূরণের জন্য যেমন নিয়মিত সুষম খাবার ও শরীর চর্চার প্রয়োজন তেমনি মনকে সুস্থ রাখতেও প্রয়োজন মানসিক কাজ ও দক্ষতা বাড়ানো। আসলে আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবাই চাই সম্মান, সুখ্যাতি ও অর্থের মালিক হতে। এগুলোর পরিপূরণের জন্যই আমরা কাজ করি। আমাদের শারীরিক সুস্থতা, আরাম ও প্রশান্তির জন্য অবশ্যই অর্থের মালিক হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের ছাত্রজীবন শেষে একটি ভালো চাকুরীতে যুক্ত হওয়ার বিকল্প নেই। একজন ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজীবী, চাকুরীজীবী কিংবা খেলোয়াড় ভালো উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু এসব পেশায় যুক্ত হওয়ার জন্য যে শ্রম সাধনা দরকার সেটির মূল সময় কিন্তু ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনের মাত্র দশ-বারো বছর ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতার মূল স্তম্ভ। খাবারের অভাব কোনো না কোনো ভাবে মেটানো যায়। নিজে না পারলে অন্যরা সাহায্য করেন, এমনকি বিদেশ থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু নিজেকে সম্মানিত করার কাজটি কখনো কেউ করে দেয় না। একজন ব্যবসায়ী, একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, একজন চাকুরিজীবী ভালো উপার্জন করতে পারেন কিন্তু তিনি খুব সম্মানিত নাও হতে পারেন। পেশাগত সম্মান ও স্থায়ী সম্মানের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের স্থায়ী সম্মান ও খ্যাতি আসে মূলত ভালো ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে। আবারো বলছি একটি কাজ ভালো বা সুন্দর হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে অন্যের উপকার করা এবং অন্যের ক্ষতি না করা। একজন ভালো পেশার অধিকারী এই কাজটি খুব সহজেই করতে পারেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাঁদের অধিকাংশই সে সুযোগ হাত ছাড়া করে ফেলেন।

আমাকে যদি সুন্দর কর্মের মাধ্যমে সম্মানিত হতে হয় তাহলে অন্যের উপকারে কী করা যায় তার বাস্তব পরিকল্পনা করতে হবে। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকেই। প্রত্যেকের অন্তত আশি বছরের জীবনের পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। অনেকেই আছেন অবসরে গিয়ে কী করবেন তার কোনো পরিকল্পনা নেই। অর্থাৎ ষাট বছর থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় বিশ বছরের যথাযথ পরিকল্পনা না থাকার কারণে এই অতিমূল্যবান, অভিজ্ঞতায় ভরপুর জীবনটা ব্যর্থতায় রূপ নেয়। জীবনে অবসর বলতে কিছু নেই। প্রতিদিন বিশ্রামের জন্য সাত-আট ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন, এটাই অবসর। এর বেশি অবসর কামনা করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। একটি হাসপাতালের দেয়ালে এক অসাধারণ মূল্যবান বাণী দেখেছিলাম- "আহাম্মক বিশ্রাম খোঁজে বুদ্ধিমান খোঁজে কাজ"। অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনো নিষ্কর্ম ও অলস সময় কাটান না। সুতরাং চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। আশি বছর বা নব্বই বছর আদৌ কাজের জন্য কোনো সমস্যা নয়। চল্লিশ বছর বয়সে যে শারীরিক শক্তি থাকে আশি বছরে সেটি থাকে না, কিন্তু কাজ করার জন্য শারীরিক দুর্বলতা বড় বিষয় নয়। স্টিফেন হকিং সারা জীবনই হুইল চেয়ারে বসে কাটিয়েছেন, অত্যন্ত কষ্ট করেছেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন।

জীবনের সুন্দর পরিকল্পনা তৈরির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মহামানবদের জীবন অধ্যয়ন এবং ভালো মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, "অসৎ বন্ধুত্বের চেয়ে একাকী থাকা উত্তম, একাকী থাকার চেয়ে সৎ বন্ধুত্ব অধিকতর ভালো। খারাপ কিছু লেখার চেয়ে চুপ থাকা ভালো এবং চুপ থাকার চেয়ে ভালো কিছু লেখা ভালো।" এখানে কমপক্ষে দুটো বিষয় এসেছে : সৎ বন্ধুত্ব নির্বাচন করা, যা একা থাকার চেয়ে অনেক উত্তম। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ভালো কিছু লেখা। ভালো কিছু লেখার জন্য অবশ্যই ভালো পড়া লেখা করতে হবে। ইমাম গাযযালি বলেন, বিশ্বস্ত, জ্ঞানী ও সাহসী বন্ধু না থাকলে সমাজে চলাফেরা সম্ভব নয়।

আবারও বলছি, সুন্দর কর্মের মাধ্যমেই আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে হবে। সুন্দর কর্ম মানেই হলো অন্যের উপকার করা। অন্যের উপকার করা কেবল আনন্দের জন্য নয়, বরং এটি মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের প্রতি এক মহান দায়িত্ব। আমরা চাকুরি জীবনে নির্দিষ্ট কাজ করাকেই মনে করি দায়িত্বপালন, যার বিনিময়ে আমরা জীবিকা অর্জন করি। অথচ অন্যের উপকার করা জীবনব্যাপী দায়িত্ব, যার জন্য স্রষ্টার কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আমরা যারা সুস্থ, স্বচ্ছল ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি এই দায়িত্বটা অসুস্থ, অস্বচ্ছলদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কত টাকা প্রয়োজন? বিলাসীরা যেভাবে বিলাসিতা করে আমার কি প্রয়োজন তাদের মত বিলাসী হওয়ার চেষ্টা করা? আমার উপার্জন থেকে দুটো পয়সা যদি অসহায় মানুষদের জন্য, দুঃস্থ গরীবদের জন্য, দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য, শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য আমি ব্যয় করি তাহলে কি আমার খুব কষ্ট হয়ে যাবে? কখনো না। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের প্রিয় জিনিস উৎসর্গ করবে না তারা কখনো পূণ্যবান হতে পারবে না।" টমাস একুইনাস বলেছেন, মানুষকে সম্পদ দেওয়া হয়েছে অভাব পূরণের জন্য, সুতরাং যার নিকট বেশি সম্পদ রয়েছে সে অন্যের অভাব পূরণে সাহায্য করবে। বর্তমান যুগের একজন খ্যাতনামা নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গার বলেন, আমাদের ধনীদের সম্পদের ১০% যদি গরীবদের জন্য ব্যয় হতো তাহলে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এত কষ্ট থাকত না। সক্রেটিস বলেছেন, "আমি চাই কত কম খরচে আমি চলতে পারি।" বিলাসীদের পক্ষে আসলে অতিরিক্ত বিলাসী খাবার ভোজন করাও সম্ভব হয় না, বরং অধিকাংশই এক কাপ চায়ের মাত্র অর্ধেক খেয়ে থাকেন, বাকী অর্ধেক নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখার জন্য ডাস্টবিনে ফেলে দেন, যেখানে এক কাপ চায়ের দাম পড়ে মাত্র চারশত টাকা! কেউ কেউ কুরবানি করেন, আর গোশত না খেয়ে বা অন্যদেরকে না দিয়ে শুধু কয়েকটি ফ্রিজে ভর্তি করে রাখেন, হঠাৎ কোনো গুরুত্বপূর্ণ মেহমানের আপ্যায়নের জন্য। ঘটনাক্রমে সারা বছর সেই মেহমানদারি করার সুযোগ হয় না। নতুন বছরে নতুন কুরবানির গোশত তাঁরা কোথায় রাখবেন? এটা কৃপণদের আরেকটা নমুনা। এছাড়া পাহাড় পর্বত জয়, দেশ-বিদেশে গমন, সমুদ্র ভ্রমণ ইত্যাদি যদি আল্লাহর সৃষ্টিশৈলীকে উপলব্ধি ও শিক্ষার জন্য হয় তাহলে তো ভালো, আর যদি হয় বন্ধুদের সামনে নিজেদের অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী কিছু করে দেখানো তাহলে নিঃসন্দেহে তা পয়সার অপচয়। যদি এই ব্যয়ের অর্ধাংশ তাঁরা অসহায়দের সাহায্যের জন্য উৎসর্গ করতেন তাহলে তারা আরো বেশি মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন।

পয়সার অপচয়ের চেয়ে সময়ের অপচয়ও ভয়াবহ অপরাধ। মানব কল্যাণে পাঁচটি মিনিট সময় কি ব্যয় করা যায় না? মানুষকে স্রষ্টা সমান যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। কেউ এক ঘণ্টায় যা পারেন কারো তিন দিনেও সেটি সম্ভব হয় না; আবার কেউ মোটেও তা করতে পারেন না। কিন্তু যারা সহজে ও অল্প সময়ে পারেন তারা অধিকাংশই অলসতা করে কাটান। উদ্দেশ্যহীন গল্প আড্ডা ও ভোজন রসিকতা না করে এই সময়টা যদি মানবতার কল্যাণে কেউ কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন তার পক্ষে যশ, খ্যাতি, সম্মান অর্জন অনেক সহজ হত এবং সহজে তিনি মহামানবেও পরিণত হতে পারতেন।

মানুষের উপকারের জন্য আমরা অর্থব্যয় করে, শিক্ষায় সহায়তা করে, বিনে পয়সায় ছাত্র পড়িয়ে বা রোগী দেখে তাৎক্ষণিক কিছু করতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী ও পরকালীন কল্যাণের জন্যই মূলত নিজেদের প্রস্তুত করি। নিজেকে আমৃত্যু মানবকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করার জন্য আমাদের সুন্দর পরিকল্পনা ও দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিকে আমরা কাজে লাগাবো। যারা শুধু দোয়া-কালাম পড়াকেই ধর্ম মনে করেন, তারা আসলে ভুল করেন। দোয়া-যিকিরের উদ্দেশ্যও আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির সাথে সাথে স্বার্থপরতা ত্যাগ করে মানুষকে সুন্দরের পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে আসা। যদি আমরা তা করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর ও সফল হবে।

স্টুডেন্টস কর্নার

নাম : ওয়ালী হাসান
কলেজ নম্বর : ১২৯৮৬
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : দিবা

মাতৃভূমি

কেমন করে ভুলি আমি
আমার গ্রামের কথা,
রোজ সকালে পাখির ডাকে
ঘুম ভাঙ্গে যেথা।

পূর্ব আকাশে রাঙা হয়ে
সূর্য উঠে যখন,
গাছের পাতায় রোদের ঝিলিক
দেখায় রুপার মতন।

কাক ডাকা দুপুর বেলায়
ক্লান্ত হয়ে ফিরি,
শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে
ছোট মাছ ধরি।

বিকেল বেলার মিষ্টি হাওয়ায়
মনটা ভেসে যায়,
নদীর পাড়ে বটের ছায়ায়
রাখাল গান গায়।

ঘরে ফেরার আনন্দে মাঝি
নৌকা চালায় জোরে,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা
সবাই ফেরে তাদের নীড়ে।
দুপুর রাতে হঠাৎ
শেয়াল যখন ডাকে
ভয়ে তখন কাঁপতে কাঁপতে
জড়িয়ে ধরি মাকে।

নাম : মাহমুদ উল আরাফাত
কলেজ নম্বর : ১২৭২৩
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : দিবা

আমার প্রিয় স্কুল

(ক)

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
সকলের প্রিয় স্কুল,
সাজানো বাগানে আমরা সবাই
যেন ফুটন্ত গোলাপ ফুল।

স্বপ্ন ছিল ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে
আমি পড়বো,
আদব-কায়দা লেখা-পড়া শিখে
দেশকে ভালো গড়বো।
রাতের বেলা পড়া শেষে ভাবি
সকাল হবে কখন!
স্কুলে না যেতে পারলে
কাঁদে আমার মন তখন।

মা

(খ)

যে আমার চোখের মনি
সোনার চেয়ে দামি,
মায়া ভরা মুখখানি তার
তাকেই আমি চিনি।

মায়ের শাসন আদর স্নেহে
করছি লেখাপড়া,
মাকে পেয়ে জীবন আমার
স্বপ্ন সুখে ভরা।

নাম : সুহাইল আবরার রহমান
কলেজ নম্বর : ১২৭২০
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : দিবা

নাম : তাহমিদ জোহান স্বাধীন
কলেজ নম্বর : ১২৭৩৫
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : প্রভাতি

ইচ্ছে

ইচ্ছে করে
মনের সুখে
খেলতে বিশাল মাঠে,
ইচ্ছে করে
যেতে আমার
গাঁয়ের বিশাল হাটে।
ইচ্ছে করে
সাঁতার কাটি
সোনা দিঘির জলে,
ইচ্ছে করে
গল্প শুনি
নিঝুম সন্ধ্যা হলে।
ইচ্ছেগুলো
হয় না পূরণ
সবই থাকে বাকি,
কারণ হলো
এই যে আমি
ঢাকা শহরে থাকি।

নাম : মুসান্না সাওকি
কলেজ নম্বর : ১২৯৩৫
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : দিবা

মজা

আমাদের খুব মজা
লেখাপড়া নাই রে,
কাউকে কিছু না বলে
থাকি শুধু বাইরে।
আমরা তো সবসময়
স্কুলে যাই না,
অঙ্ক টিচারের
বকা ঝকা খাই না।
হুট করে রেগে যাই
ছুটে রুমে ঢুকে যাই,
কোথায় যে যেতে চাই
কিছু না ভেবে পাই।

আমার বিদ্যালয়

আমি তোমাকে ভালোবাসি
তোমাকে ধারণ করি হৃদয়ের মাঝে;
তোমার ভালোবাসায় আজ আমি মহিয়ান
তাই পাড়ার বন্ধুরা বলে আমি তো রেমিয়ান।
তোমার এই বিশাল ক্যাম্পাসে
কত পাখি গান গায়,
কত প্রজাপতি মেলে ধরে রঙিন ডানা
পড়াশুনা আর খেলাধুলায় এখানে নেই কোনো মানা।
ক্লাসের সময় বন্ধুরা মিলে পড়াশুনায় থাকি ন্যস্ত
ছুটির পর খেলাধুলা নিয়ে আমরা সবাই থাকি মহাব্যস্ত।
বাবা-মায়ের পরে যাঁদের পেয়েছি আপন করে
তাঁরা আমার গুণধর শিক্ষক আর মাননীয় অধ্যক্ষ।
দোয়া করো যেন আমার শিক্ষা দীক্ষায়
উন্নত হয়ে অবদান রাখি দেশ রক্ষায়।

নাম : নাসিরুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১৭৮৩২
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : প্রভাতি

আমার মা

মা আমার লক্ষ্মী সোনা
আমার রাতের চাঁদ
সারাটি বেলা দেখে দেখে
মেটে না মোর সাধ।

সারা জীবন রেখো মা
আমায় তোমার কাছে
বুঝিনা মা তোমার স্নেহে
কী যে মধু আছে।

এত কষ্ট করে তুমি
ভালোবাসা দিলে আমায়
তাই তো আমি সারা জীবন
চাই যে শুধু তোমায়।

মা আমায় আগলে রেখো
তোমার শীতল ছায়ায়
আমার জীবন ভরিয়ে দিও
তোমার মধু মায়ায়।

নাম : নাফি হাওলাদার
কলেজ নম্বর : ১২৭০৮
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : দিবা

সময়

এক মিনিট সময় চলে গেলে,
ফিরে পাবে নাকো আর।
সময়ের মূল্য দিতে শেখো
তুমি এইবার।
সময় ফিরে আসবে নাকো,
তোমার কাছে আর।
অতীতকালে যেওনা ফিরে,
দেখ বর্তমান।
তোমার কাছে ভবিষ্যত
তোমার রয়েছে অতীত
সময়ের মূল্য যে দেয়
সেই হলো ঠিক।

নাম : সাজিদ মাহমুদ হায়দার
কলেজ নম্বর : ১১৯৯২
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : বি (প্রভাতি)

চেষ্টা

করলে চেষ্টা প্রাণপণ
সফলতা আসবেই,
থাকলে সততা, সবাই
তোমাকে ভালোবাসবেই।

নিয়ম মানতে হবে তোমাকে
হতে হবে নিয়মানুবর্তী,
নিয়ম মানলে তুমি রবে
সবার আগে, হবে অগ্রবর্তী।

তার আগে দরকার হবে
নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টা,
তবেই তুমি হবে সফল
যদি চান স্রষ্টা।

নাম : আফফান ইবনে মুনাজ্জাম
কলেজ নম্বর : ১১১৬২
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (দিবা)

DRMC তোমায় মনে পড়ে

বন্ধ দুয়ার খুলবে কবে
সদা হিসেব কষি,
ডিআরএমসি তোমার কথা
ভাবি দিবানিশি।

স্বপ্নে দেখি তোমার
ঐ সবুজ ভরা মাঠ,
আরও দেখি শিক্ষাগুরুদের
মনোমুগ্ধ পাঠ।

মিস করি বন্ধুদের
রং করা মুখ,
দৌড়াদৌড়ি - ছুটাছুটির
অবারিত সুখ।
ভুলের সাজা দিচ্ছে খোদা
জানি দুষ্টুদের,
করোনা ভাইরাস হতে বাঁচাও
প্রভু, তুমি আমাদের।

নাম : সামাউল সাইফ সরদার (প্রান্ত)
কলেজ নম্বর : ১১১৭৪
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (দিবা)

প্রিয় খেলা ফুটবল

ফুটবল আমার প্রিয় খেলা
ফুটবল আমার জান
যতই খেলি ফুটবল আমি
ভরে না তো প্রাণ।

স্কুলে এসে খেলি ফুটবল
খেলি ছুটির পর
আমায় নিতে এসে মা বলে,
"খেলবি কত, বল?"

মা বলে, "বাসায় চলো,
সন্ধ্যা হলো
কালকে এসে আবার খেলো।"
মন যে আমার মানে না আর
শুধু খেলতে চায়,
অবশেষে বাড়ি ফিরি
পায়ের ব্যথায়।

যাবার বেলা মাঠের দিকে
ফিরে ফিরে তাকাই,
কালকে এসে খেলব আবার
আজকে বিদায়।

নাম : আফরাজ হোসেন জাইন
কলেজ নম্বর : ১৭০১৭
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (দিবা)

বঙ্গবন্ধুকে চিনি

এ যুগেরই সন্তান আমি-
স্বাধীন দেশের ছেলে
যে দিকে দু'চোখ মেলি
যুদ্ধের গল্প মেলে।

আমি যুদ্ধ দেখিনি কভু
দেখিনি রণের রক্ত,
তবুও স্বাধীনতায় আমি
মুক্তিকামীর ভক্ত।
দেখিনি আমি পশ্চিমাদের
শোষণ কিংবা শাসন
শুনেছি আমি বঙ্গবন্ধুর
যুদ্ধে যাবার ভাষণ।

মনের পটে আগুন জ্বালায়-
পাক নেতাদের বুলি,
সৃষ্ট ঘৃণার তেষ্টা মেটায়
করি তাদের গুলি।

আমি যুদ্ধ দেখিনি-
বঙ্গবন্ধুকে চিনি,
সাহসী স্বরে তর্জনীটা
উঁচু করেন যিনি।

কোটি কোটি এই বাঙালি-
ফুলের মালা গলে,
স্বাধীনতার ত্যাগে যাকে
জাতির জনক বলে।

বঙ্গবন্ধু মনে মোদের
জাতির দিশারী,
মৃত্যু তাঁর শত্রুর হাতে
এ যে আরেক হুঁশিয়ারি।

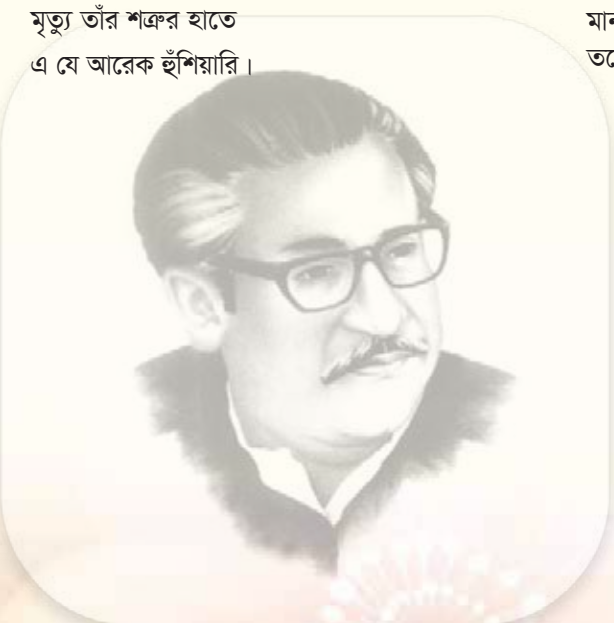

নাম : এস.এম ইতেখারুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১১২২০
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (দিবা)

প্রতিজ্ঞা

আমরা যারা শিক্ষার্থীগণ
আমাদের হবে আসল পণ
লেখা পড়ায় সদা রাখব মন
সৎ চিন্তা করব সর্বক্ষণ।

আমাদের হবে একটাই ব্রত,
সৎ কাজে সদা থাকব রত।
গুরুজনের কথা মেনে চলব,
সত্য কথা সদা বলব।

এমন হবে মোদের আচরণ,
আশীর্বাদ করেন যেন
গুরুজন।

মানব সেবায় করব আত্মদান,
তবেই থাকবে সবার মান।

নাম : আব্দুল ফাত্তাহ বিন ফোরকান
কলেজ নম্বর : ১৮৬০৮
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

মা জননী

ওগো মা জননী, পেয়েছি আমি জীবনের পূর্ণতা
আমার এ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তোমায় ঘিরে
তোমার কোলে দুঃখ ভুলে
মন ভরে যায় আনন্দে।
সেই আনন্দে, হৃদয় আমার নেচে ওঠে ছন্দে!
জনম দুখি জননী, তোমার কথা ভেবে বৃথা
দিবা রাত্রি নিদ্রা হারা, মনে লাগে ব্যথা
বিপদে আমি স্মরি তোমার দেওয়া কথা।
যতদিন বাঁচব আমি নশ্বর এ দুনিয়ায়,
তোমায় রাখব আমি হৃদয়ের মণি কোঠায়।

নাম : মোঃ আরাফাত রহমান
কলেজ নম্বর : ১৮৪৫৪
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

বনমানুষ

প্রত্যেক দিন পড়ো পড়ো
মানুষ হয়ে ভাগ্য গড়ো
আব্বু কেন রোজ আমাকে মানুষ হতে বলে
তাহলে কি সত্যি আমি বনমানুষের দলে?

আব্বু মানুষ, আম্মু মানুষ, আমিও মানুষ তবে
বনমানুষের মতন আমি কাজ করেছি কবে?
খাদ্য আমি হাত দিয়ে খাই দুই পা দিয়ে হাঁটি
ঘাস খাই না, কামড়াই না, আঁচড়াই না মাটি।

প্রত্যেক দিন গোসল করি, শ্যাম্পু করি চুলে
কাপড়জামা ছাড়াই আমি, যাই নাকি ইশকুলে?
এই যে দেখো গেঞ্জি, টি-শার্ট, এই যে মোজা-জুতো
রাগলে আমি দাঁত খিচিয়ে মারতে আসি গুতো?
তাহলে ক্যান ফেলবে আমায় বন মানুষের দলে
মানুষ হতে বললে কিন্তু পালাবো জঙ্গলে।

আব্বু তখন আদর করে জড়িয়ে ধরেন বুকে
বলেন, "বোকা, অমন কথা আনিস না তুই মুখে।"
মানুষ মানে শ্রেষ্ঠ মানুষ ধন্য জ্ঞানে-গুণে
এই পৃথিবী চমকাবে যার কীর্তিগাথা শুনে।
তেমনতরো শ্রেষ্ঠ মানুষ হতেই হবে তোকে
নইলে কিন্তু বনমানুষই ভাববে তোকে লোকে।

নাম : মাহির জামান চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ৯৪৮৯
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : খ (দিবা)

To-Let

এই শহরের To-Let সাহেব
অনেক বাড়ি তার,
সব গলিতেই বাড়ি আছে
রাস্তা হলেই পার,
দেখতে পাবেন নানান রকম
To-Let আছে ঝুলে,
অনেক কিছু চুরি হলেও
হয় না চুরি ভুলে।
ফন্দি-ফিকির করে যারা
হচ্ছে বাড়ির মালিক
গিন্নী থাকে লাট-বাহাদুর
কর্তা ভীতু শালিক।
নানান রকম শর্ত থাকে
বাড়ি ভাড়া নিয়ে,
কথাবার্তা সুপার ফাইন
কষ্ট বাড়ায় বিলে।
হয়তো গেলেন করতে গোসল
গা ভিজালেন যেই,
আরে! আরে! হলোটা কী
পানি সাপ্লাই নেই!
গিন্নী তখন দৌড়ে গিয়ে
বলল, "পানি চাই।"
বাড়িওয়ালি বললো কেশে,
"দেখেন কারেন্ট নাই।"
বাড়িওয়ালির কত্তো আরাম
মেজাজটা কেবল খিটখিটে,
সুযোগ টুযোগ না দিয়ে সে
ব্যস্ত ভাড়া বাড়াতে।

নাম : এল.এম. মাহির লাবিব
কলেজ নম্বর : ৯৪৩৭
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ই (দিবা)

রসগোল্লা

খাবার টেবিলে আমি
খেতে বসি যখন
রসগোল্লা চাই-ই চাই
বলি আমি তখন।

কী দারুণ খেতে আহা
রসে ভরা মিষ্টি
মানুষের হাতে গড়া
এ কেমন সৃষ্টি!

খেলার আগে আমি
রসগোল্লা খাই
গোল্লাছুটে যেন তাই
সবাইকে হারাই।

মা বলে, "সারাদিন
করো খাই খাই
রসগোল্লা ছাড়া যেন
হাসিটা তোমার নাই।"
রসগোল্লা রসগোল্লা
কী দারুণ খেতে
স্বপ্নেও তোমাকে চাই
চাই দিনে রাতে।

নাম : আতিক ইসরাক
কলেজ নম্বর : ১৮৫২৪
শ্রেণি : নবম, শাখা : এফ (প্রভাতি)

আমি গর্বিত এক ছাত্র

আমি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র
দেশের সেরা কলেজ এটি সন্দেহ নেই মাত্র
বায়ান্ন একর জমি নিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
এই কলেজের কৃতি ছাত্র সব বিশ্বে পায় স্থান;
উনিশ শ' ষাট সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত
ব্রিগেডিয়ার কাজী শামীম খ্যাতনামা অধ্যক্ষ
জ্ঞানীগুণী শিক্ষকেরা জ্ঞানের আলো ছড়ান
জ্ঞানের মশাল নিয়ে জ্বলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ;
শিল্পকলা, সৃজনকাজে আমরা থাকি রত,
এই কলেজের ছাত্র হয়েই আমি গর্বিত।

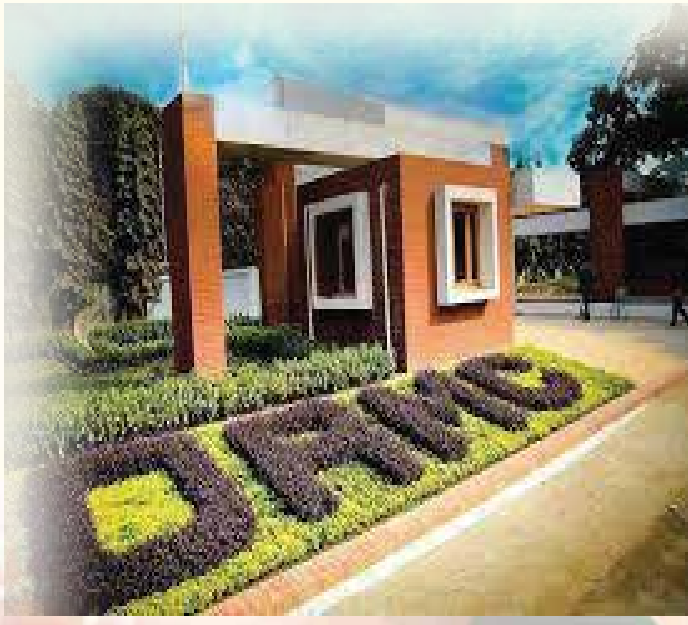

নাম : ফারহান লাবীব শিহাব
কলেজ নম্বর : ১২৫৫২
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ঘ (দিবা)

অর্ধশত আর এগারটি বছর

আজ মোরা তীর্থের কাক
তোমার সবুজ পানে ছুটে যেতে চাই
আজ মোরা তীর্থের কাক
তোমার সেই শুভ্র বর্ণ হতে চাই।
আজ মোরা তীর্থের কাক
তোমার মায়ায় সিক্ত হতে চাই।
আজ মোরা তীর্থের কাক
সত্যিই তীর্থের কাক।

ফিরে যেতে চাই সেই শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে
ফিরে পেতে চাই সেই স্বর্গের উদ্যানে
হারিয়ে যেতে চাই বিস্তৃত দিগন্তে।

শুভ জন্মদিন! প্রিয় বিদ্যায়তন,
হয়েছে তো কেবল অর্ধশত আর এগারটি বছর।
শুভ জন্মদিন! প্রিয় বিদ্যায়তন,
পাড়ি দিতে হবে আরও অজস্র বছর
কেননা আরও সতেজ প্রাণ অপেক্ষমাণ
'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' বলে করবে মহীয়ান।

নাম : মাহমুদুল হাসান রোহান
কলেজ নম্বর : ১৮১৩৬
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : খ (প্রভাতি)

অবিনাশী সংগ্রাম

শত শত চোখে আকাশটা দেখে
শত শত মানুষের দল,
সেদিন মোরা ছিলাম অসহায়
চোখে ছিল মোদের জল।
অধিকার থাকা সত্ত্বেও মোরা
খুলিতে পারিনি মুখ,
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই
ঝাঁঝরা হতো বুক।
কিন্তু মোরা সাহসী জাতি
পাইনিকো কভু ভয়,
আমাদের তাই নিশ্চিহ্ন করতে
পাকিস্তানিরা উদ্যত হয়।
গভীর রাতে ভীতু দলেরা
আসত হায়েনার বেশে,
যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে মারল
শিশুদেরও ছাড়েনি শেষে।
অনেক সয়েছি আর নহে
লড়ব মোরা দেশের তরে,
বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় তাই
দুর্গ গড়েছি ঘরে ঘরে।
দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করেছি
বাজি রেখে মোদের প্রাণ,
লক্ষ্য মোদের ছিল একটাই
রাখব দেশের মান।
দেশমাতাকে বাঁচাতে মোরা
লড়েছি বীরের বেশে,
মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে
হায়েনারা পালিয়ে গেল শেষে।
ছিনিয়ে আনলাম স্বাধীনতা
অর্জিত হলো বিজয়,
সেদিন থেকেই বাংলাদেশ
ভুলে গেছে সব পরাজয়।
অনুপ্রেরণায় ছিলে তুমি
সৃষ্টির সেরা জীব,
ভুলব না তোমায় কখনো মোরা
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
তুমি শেখ মুজিব।

নাম : সাইদুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১৬৩১৯
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

চার আনার দাম

রক্তের দাগ শুকায়নি আজও
মুছেনি যে হাহাকার,
আমার জাতির আর্তচিৎকার
শোনার সময় আছে কার?

তোমরা মোদের দিয়েছ স্বাধীনতা
তাইতো আজ গর্বিত মোরা,
তবুও যে নেই কোনো পূর্ণতা
দেশ ভরে গেছে হাজার চোরে।

সাম্রাজ্যবাদ বেঁধেছে মোদের আষ্টেপৃষ্ঠে
বাঁচার নেই যে কোনো পথ
দেশ মাতা যে শুধুই মোদের
করেছি যে এই শপথ।

চলো রুখে দেই সকল অন্যায়
যুদ্ধ করি যোদ্ধা বেশে
তবেই তো ফিরে পাবো
সুখ-শান্তি দিনের শেষে।

হে সাম্রাজ্যবাদীরা!
দেশটা মোদের,
ছিনিমিনি খেলো না
বাঁচতে দিব না তোদের।

আমাদের আছে অসীম সাহস
আছে উদ্দাম
কেটে পড়
নয়তো দেব না চার আনারও দাম।

নাম : মোঃ মাহমুদুল হাসান কিরণ
কলেজ নম্বর : ১৮১৪৭
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : খ (প্রভাতি)

জগা-খিচুড়ি

চাল দিয়ে কেউ ডাল রাধে, মসলা পাবে কই,
ডাল দিয়ে কেউ মসলা ভাজে, সরিষা দিয়ে খৈ।
ঝোলা গুড়ে ইলিশ ভাজা, তেলে ভাজা মিঠা,
ঝাল দিয়ে রাধা দুধের ক্ষীর আর টকের ধুপা পিঠা।
ঘোড়া যদি ডিম পাড়ে আর গাধার থাকে শিং,
মানুষ যদি আঙ্গুল রেখে নাকে লাগায় রিং।
বৃষ্টি যদি আগুন হতো, আগুন হতো পানি,
ক্ষেত-খামার আর সৃষ্টিকুলে ঘটাত রাহাজানি।
ছাগল দিয়ে লাঙ্গল চাষ, মুরগি দিয়ে মই,
টিস্যুপেপার দিয়ে যদি ছাপাত কেউ বই।
পানির উপর চলতো যদি রেলগাড়ি বাস ব্যান্ডো,
বিশ্ব মাঝে সৃষ্টি হতো জগা-খিচুড়ি কাণ্ড।

নাম : এ. কে. এম মেহরাব হোসেন
কলেজ নম্বর : ১২৩৮৪
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : চ (দিবা)

পথের আর্তরব

নিষ্ঠুর নিয়তি, বা যে যা বলো ভাই
সব কিছু ছাড়িয়ে
শুধু করি হায়-হায়,
ঘর থেকে বের হই
সাথে দুশ্চিন্তা
এখনই যে উবে যাবে সম্পূর্ণ প্রাণটা।
তবুও গতি তার
থামানো যে ভার
কেবলই কানে আসে, আর্ত চিৎকার।
যুগ-যুগ ধরে ভাই
চলছে এই খেলা
কবে ভাই থামবে, এই অবহেলা।
আইন যে আছে তবু
তার প্রয়োগ নাই
এভাবেই ভূরিভূরি জীবন হারাই।
জীবন বাঁচাতে হলে
পরিবর্তন চাই
চলুন সবাই মিলে জীবন বাঁচাই।
ট্রাফিক আইনগুলি
সবাই মেনে চলি
চলুন সবাই মিলে সচেতন সমাজ গড়ি।

নাম : এইচ এম সামিন রেজা
কলেজ নম্বর : ১৮২৩০
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : জি (প্রভাতি)

লকডাউন

ব্যস্ত শহর স্তব্ধ এখন থমকে আছে সব
মুখর রাস্তাটিও জনশূন্য যে আজ হয় না কলরব।
রোজ সকালে ঘুম ভাঙ্গে না ফেরিওয়ালার ডাকে
আইসক্রিমওয়ালাও আসে না এখন, হয়তো বাসায় থাকে।
নামাজের জন্য রহিম চাচাও ডাকে না এখন আর
মসজিদগুলো শূন্য থাকায় মুখ যে তার ভার
টিভি আর মোবাইলটাকেও এখন ভাল্লাগেনা
বিকেল বেলা বন্ধুগুলো খেলতে আর ডাকে না।
ফরিদ চাচা অভুক্ত আজ চা বিক্রি বন্ধ যে
আজকে দাদুর অসুস্থতার খরব নেয় বা কে?
চিলেকোঠায় বসে তাই শুধু অপেক্ষায় প্রহর গোনা
চোখের মাঝে নতুন দিনের রঙিন আল্পনা।
হয়তো কোনোদিন শান্তির বার্তা আসবে নতুন ভোরে
আবার দেখা হবে সবার সাথে এক সুস্থ শহরে।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি

সুহাইল আবরার রহমান রাওফিন
কলেজ নং: ১২৭২০
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: বি (দিবা)

কমান্ড পোস্ট

কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট এ আমার বাবা এরিয়া এফসি হিসাবে পোস্টিং পাবার পর আমি বাবা আর মা এর সাথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমরা সকালে ঢাকার কমল াপুর থেকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলাম। বাবা আমাকে যুদ্ধ সমাধি (War Cemetery) দেখতে নিয়ে গেলেন। এতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত প্রায় ৭৫০ জন সৈনিককে সমাহিত করা হয়েছে এবং আমি বাবার কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারলাম। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও যে আমাদের দেশে আরো একটা যুদ্ধ হয়েছিল সেটা জেনে আমি অবাক হলাম। এরপর বাবা আমাকে আরো একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন যেটা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত এবং যেখানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। এটি হচ্ছে 'কমান্ড পোস্ট'। এখানে সবাইকে যেতে দেয় না, তাই বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে সেই কমান্ড পোস্ট এর গল্প শোনাচ্ছি।

আমি বাবার কাছে জানতে পারলাম যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) ফ্রন্টের কমান্ড পোস্ট হিসেবে এটি ব্যবহার করা হতো। এই কমান্ড পোস্টের কমান্ডার হিসেবে ছিলেন একজন ফিল্ড মার্শাল। তাঁর নাম ফিল্ড মার্শাল উইলিয়াম জোসেফ স্লিম। কমান্ড পোস্টের বাইরে এই ফিল্ড মার্শাল এর ভাস্কর্য রয়েছে। ফিল্ড মার্শাল উইলিয়াম জোসেফ স্লিম ০৬ আগস্ট, ১৮৯১ সনে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১ম বিশ্বযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধে এই কমান্ড পোস্ট হতে তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৩-১৯৬০ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমি আমার বাবার কাছে শুনলাম যে, উনি এখান থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কমান্ড করতেন। আমি বাবার সাথে (কমান্ড পোস্ট প্রায় ১০০ ফুট মাটির নিচে) সিঁড়ি দিয়ে কমান্ড পোস্টের ভিতরে নামলাম। আমার একটু ভয় করছিলো। পরে বাবার অনুরোধে ২ জন আর্মি সৈনিক আমাদেরকে নিচে নিয়ে গেলো। কমান্ড পোস্টে ১০-১২টি ঘর রয়েছে যেখানে ফিল্ড মার্শাল স্লিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিস ও ভাঙ্গা আসবাবপত্র রাখা আছে। এই কমান্ড পোস্ট মাটির নিচে চাপা পড়েছিল। পরে মাটি খুঁড়ে এটি পুনরায় উদ্ধার করার সময় যে সকল জিনিস আবিষ্কার করা হয়েছে সেগুলো জাদুঘরে রাখা হয়েছে। জাদুঘরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন ম্যাপ, ছবি, কমান্ড পোস্টের পুরাতন ছবি সংরক্ষণ করা আছে। এখানে গর্ত করার সময় যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়েছে তা আমি দেখেছি। কমান্ড পোস্টে বাইরে একটি উঁচু টাওয়ার আছে। বাবা বললেন এই টাওয়ার দিয়ে মাটির নিচে বাতাস চলাচল করতো।

আমি কমান্ড পোস্টের ভিতরে ছবি তুলতে চাইলাম কিন্তু আর্মি আঙ্কেলরা ছবি তুলতে নিষেধ করলো। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। পরে বাবা আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, আর্মিদের সংরক্ষিত এলাকায় ছবি তোলা আইনত নিষেধ। তবে আর্মি আঙ্কেলরা আমাকে বললেন যে, বাংলাদেশের একমাত্র কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনম্যান্টেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এ ধরনের কমান্ড পোস্ট আছে। কমান্ড পোস্ট থেকে আসার সময় আমার খুব মন খারাপ লাগছিলো। কারণ আমি আরো সময় থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা বললেন নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কমান্ড পোস্টে থাকার নিয়ম নেই। বাবা অবশ্য আমাকে কথা দিয়েছেন যে আমাকে আবারও কমান্ড পোস্ট দেখাতে নিয়ে যাবেন।

হিমাংশু দেবনাথ
কলেজ নম্বর: ১৮২৮৫
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (প্রভাতি)

একজন মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের একটি ছোট্ট গ্রাম মনিরামপুর। বিশ বছরের যুবক মাহিন তার ছোটভাই ও মা-বাবার সঙ্গে বসবাস করতো এই গ্রামে। সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল তাদের। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, মাহিন ও গ্রামবাসীরা রেডিওতে শুনতে পেল ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের আক্রমণ ও দেশের শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধের কথা। গ্রামবাসীরা ভয় পেলেও মাহিনসহ গ্রামের যুবকরা তাদের সাহস যোগালো। কিন্তু ১৯৭১ সালে ২৩ এপ্রিল হানাদার বাহিনী মনিরামপুর গ্রামে আক্রমণ চালায়, আগুন ধরিয়ে দেয় গোটা গ্রামে।

মাত্র কয়েকজন গ্রামবাসী ও মাহিন পালিয়ে আসে জঙ্গলে। মাহিন যুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু সে প্রতিশোধ নেবে, ছাড়বে না হানাদার বাহিনীদের। যেসব গ্রামবাসীরা পালিয়ে এসেছিল তারাও যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করলো। আশেপাশের গ্রামের পালিয়ে আসা মানুষের কাছে মাহিন জানতে পারলো হানাদার বাহিনীরা হাজার হাজার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, শিশুদের হত্যা করছে এবং মা-বোনের উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। রাগে ক্ষোভে তার মন বিষিয়ে উঠলো । দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট অপারেশন শেষে মাহিন মনিরামপুরের কাছাকাছি চলে আসলো। মাহিনের দলে ১৫ জন। ১৯৭১ সালের ২০শে জুলাই। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। হানাদার বাহিনীরা গোলাবর্ষণ শুরু করলো। আত্মরক্ষার জন্য মাহিনরা পরিখাতে আশ্রয় নিলো। মেশিনগান চালাচ্ছিলেন যে গ্রামবাসী, হঠাৎ করে তাঁর বুকে গুলি বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল মেশিনগান। মাহিন পাশেই ছিল। সে এক মুহূর্তে দেরি না করে গুলি ও গোলাবর্ষণ শুরু করলো। বিকাল ৬টা পর্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল। মাহিনরা এখন মাত্র ০৮ জন। তাদের অন্য বন্ধুরা অস্ত্রশস্ত্র ও এক তেরো বছরের ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসলো। মাহিন ছেলেটিকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে বুকে জরিয়ে ধরলো। এ যে তার ছোটভাই শাহিন। এখানে অনেক বিপদ তাই সে শাহিনকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বললো। ১৯৭১ সালের ২২ জুলাই। মাহিন পরিখার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগলো মেশিনগান। মাহিনরা এখন মাত্র ৬ জন। হঠাৎ করে হানাদার বাহিনিদের কাছ থেকে গুলি ও গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। মাহিনরা ভাবল, তারা সবাই মিলে শত্রুদের হত্যা করে ফেলেছে। হঠাৎ একটি গোলা এসে পড়ল পরিখার মধ্যে। সবার শরীর গোলার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মাহিন ঢলে পড়লো সবুজ বাংলার মাটিতে। মাহিন শহিদ হলো।

আল আযওয়াদ বিন আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৮৭৬৭
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

বাক্স পাগলী

আমার নানাভাই মৃত মো. আবুল হোসেন মল্লিক একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। নানা ভাই যখন মারা যান তখন আমার বয়স মাত্র দেড় বছর ছিল, সে কারণে নানাভাইয়ের মুখে মুক্তিযোদ্ধের গল্প শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

গত বছর শীতকালীন ছুটিতে নানু বাড়িতে এক সপ্তাহ বেড়াতে গিয়েছিলাম । রাতে আমি নানুর কাছে ঘুমাতাম দ্বিতীয় রাতে বাইরে একটা মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব করুণ সুরে কি যেন বলেছিলেন, আমি বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ্ আকবার! মসজিদের মাইকে ফজরের আযান দিচ্ছিল। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল। আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে আবার ঘুমিয়ে গেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নানুর বানানো নানান রকম পিঠা ও খাবার খেয়ে আমার খালুর সাথে গ্রামে ঘুরতে বের হয়ে গেলাম। সারাদিন অনেক ঘুরাঘুরি ও মজা করে আমি রাতের ঘটনা ভুলে গিয়েছি।

পরের রাতে আবার নানুর সাথে ঘুমিয়েছি। নানুর কাছে গল্প শুনতে-শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি! গতরাতের সেই একই আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি নানুকে জড়িয়ে ধরে বললাম,এটা কিসের আওয়াজ নানু? আমার খুব ভয় করছে। নানু হেসে বললেন ধুর বোকা ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওটা আমাদের বাক্স পাগলী! আমি বললাম-বাক্স পাগলীকে নানু? নানু বললেন এখন ঘুমাও, কাল তোমাকে বাক্স পাগলীর গল্প শোনাবো।

সেদিন আমার ভীষণ কৌতূহল হল। কখন রাত হবে আর আমি নানুর পাশে শুয়ে বাক্স পাগলীর গল্প শুনব। প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আমিই প্রথমে বাক্স পাগলীর প্রসঙ্গ উঠালাম। নানুকে জিজ্ঞেস করলাম "নানু, বাক্স পাগলী চিৎকার করে কী বলে?" নানু বললেন "বাজান আ-মা-র বাজান বাজান বলে চিৎকার করে।" কেন?

শুরু হলো নানুর মুখে বাক্স পাগলীর কাহিনি শোনা। বাক্স পাগলীর প্রকৃত নাম আমেনা বিবি। একটি সরকারী অফিসের পিছনের বারান্দায় বাক্স পাগলীর বসবাস। সহায় সম্বল বলতে শুধু একখানা মরিচা-বাক্স। ছোট টিনের বাক্সটি সবসময় কোলের উপর নিয়ে মহল্লা ও আশেপাশের এলাকায় হাঁটেন আর চিৎকার করে বলেন-" বাজান আ-মা-র বাজান।" মাঝে খুব করুণ সুরে কাঁদেন!

১২ বছর ঐ একই বারান্দাতে উনি থাকতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। ৮০-র উপরে উনার বয়স ছিল। সারাদিন সুর সুর করে বেড়াতেন কিন্তু কখনো কারোর সাথে কথা বলতেন না। কোন চাহিদা ছিল না। কেউ খাবার দিলে খেতেন, ইচ্ছা না হলে খেতেন না। এক কাপড়ে অনেক দিন থাকতেন, তারপরও কাপড় পাল্টাতেন না এবং শীতের কাপড় পরতেন না। পরে অবশ্য স্থানীয় লোকেরা তাঁকে কাঁথা-কাপড় দিয়েছিলেন। এক ভোরে আর বাক্স পাগলীর চিৎকার শোনা গেল না। সকালে মসজিদের মাইকে শোনা গেল- একটি শোক সংবাদ , মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বারান্দায় নাম পরিচয়হীন এক বৃদ্ধা মরে পড়ে আছেন, কেউ তাঁর পরিবার-পরিজনের সন্ধান পেলে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হলো। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বাক্স পাগলীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। ১৯৭১ সালে যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল তখন হঠাৎ একদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাক্স পাগলীর গ্রাম আক্রমণ করে। আগুন লাগিয়ে দেয় মানুষের ঘর বাড়িতে। সদ্য বিধবা আমেনা বিবির ৮ মাসের ছেলেকে ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন।

হঠাৎ এমন আগুনের খবর শুনে মানুষ জন দিশেহারা হয়ে ঘর থেকে যে যা পারে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল! আমেনা বিবিও ঘরে ঢুকে তাঁর ছোট টিনের বাক্সখানা বুকে চেপে ধরে। বেশ কিছুদুর যাওয়ার পর তার খেয়াল হলো এটা তো বাক্স, এ তো আমার বাজান(ছেলে) নয়! আবার ফিরে গ্রামের দিকে দৌড় দিল কিন্তু ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেখান থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন আমেনা বিবির "বাক্সপাগলী" হয়ে উঠা।

নানু আমাকে আরো অনেক তাঁর দেখা ও শোনা সত্য কাহিনি শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার কোনো ছুটিতে নানুবাড়ি গেলে যুদ্ধের গল্প শুনবো এবং বন্ধুদের শোনাবো।

গল্পটি শুনে আমার অনুভূতি: পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের দেশের অনেক নিরীহ ও জ্ঞানী-গুনী মানুষকে হত্যা করেছে, কখনো তাদের ক্ষমা করবো না। পাকিস্তানি কোন জিনিস আমি কোনোদিন ব্যবহার করবো না। স্যালুট জানাই আমাদের দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীন বাংলাদেশ এবং নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলে আমিও আমার দেশকে সেবা করব। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলতে চাই।

অর্ণব দাস
কলেজ নম্বর : ১৮৩০২
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: গ (প্রভাতি)

স্বপ্নের স্কুলে ভর্তি ২০২১

২০২১ সাল আমার জীবনের স্বপ্ন পূরণের বছর। ছোট বেলা থেকেই বাবার মুখে শুনতাম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের কথা। ঢাকার ভিতরে সবচাইতে সেরা কলেজ। বাবা মাঝে মাঝে রাগ করে বলতো তোমাকে হোস্টেলে রেখে আসবো। আমাকে প্রথমে ভর্তি করানো হয় সেন্ট মার্টিন প্রিপারেটরি স্কুল, তালতলা, মিরপুর। শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষার পড়াশুনা। দুই বছর আমি অনেক পড়াশোনা করেছিলাম। হঠাৎ করে শুনতে পারলাম লটারি হবে। আমি খুব ভেঙ্গে পড়েছিলাম। আমার হাতে আর কিছুই করার নেই। এখন সব কিছু সৃষ্টিকর্তার হাতের মুঠোয়। রাগ হয়ে আমি গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। বেশ কয়েকদিন থাকার পর ঢাকায় ফিরে আসি। লটারির দিন। বাবা তখন বাসায় ছিলেন। তিনি প্রথমে দেখলেন যে আমার নাম দেখা যায় নি। সবাইকে দেখে মনে হলো আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। আমার মনে হলো দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও কোন কাজ হলো না। তারপর বাবা মনমরা হয়ে বাজারে চলে গেলেন।

মা বললো চলো আবারও লটারির ভিডিওটা দেখি। বাবা হয়তো ভালোভাবে দেখেন নি। তারপর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন তুমি তোমার স্বপ্নের স্কুলে ভর্তি হতে পারবে। আমি বললাম কি আমি ভর্তি হতে পারবো? সবাই খুশিতে নেচে উঠলো। বাবা বাজার থেকে ফিরে আসেন। বাবাকে বললাম দেখো আমি আমার স্বপ্নের স্কুলে চান্স পেয়েছি। সেও আনন্দে নেচে উঠলো। আমার ছোট ভাই অনির্বাণও নেচে উঠলো। বলল দাদা চান্স পেয়েছে, চান্স পেয়েছে। করোনার জন্য বাসায় অনলাইন ক্লাস শুরু হয়। প্রতিদিন ক্লাসের সময় ভাই টিভি দেখা বন্ধ করে দেয়। বাসায় কোন শব্দ যাতে না হয়। কিছুদিন পর-সপ্তাহে একদিন ক্লাস। প্রথম যেদিন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়, সেদিনটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

অনিন্দ্য সুফিয়ান বাশার
কলেজ নম্বর: ১২৭১৪
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: খ (দিবা)

করোনার শেষে স্কুলে ফেরা

করোনার জন্য দেড় বছর স্কুল বন্ধ ছিল। এতদিন বাসায় থেকে মনটা কষ্টে ভরে গিয়েছে। তাই যখন শুনলাম সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ স্কুল খুলে যাবে, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আমার যেন দিন শেষেই হতে চায় না। অনেক অপেক্ষার পর সেই আনন্দের দিনটি এলো। বেলা এগারোটার দিকে আমি প্রস্তুত হয়ে স্কুলে রওনা হয়েছি। একপাশে সারি করে অনেকগুলো বেসিন লাগানো আছে। ঐ সময় হঠাৎ আমার প্রিয় বন্ধুকেও পেয়ে গেলাম। দুজন মিলে হ্যান্ডওয়াশ করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিলাম। তারপর শরীরের তাপমাত্রা মেপে ক্লাসরুমের দিকে দিলাম এক ছুট। ক্লাসে ঢুকে দেখি সব বন্ধুরা চলে এসেছে। এখন যদি করোনা ভাইরাস না থাকতো তাহলে আমি সব বন্ধুদের একবার করে জড়িয়ে ধরতাম।

কিছুক্ষণ পর আমাদের শ্রেণিশিক্ষক অনেকগুলো বেলুন নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। তিনি সবাইকে একটা করে বেলুন দিলেন। তারপর আমাদের ইংরেজি টিচার আমাদের সাথে নিয়ে অনেক মজার খেলা খেললেন। ড্রয়িং টিচার আমাদের ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে দিলেন। আমরা মাঠে অনেক দৌড়াদৌড়ি করলাম। কখন যে স্কুলের সময় পার হয়ে গেল, আমরা কেউই টের পেলাম না। ৩ পিরিয়ড পর পড়লো ছুটির ঘণ্টা। আমরা সবাই দৌড়ে বের হয়ে যার যার অভিভাবকের কাছে চলে এলাম। ডিআরএমসি'র ঐ দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। দিনটির কথা আমি সবসময় মনে রাখব।

তাহমিদ জেহান স্বাধীন
কলেজ নম্বর: ১২৭৩৫
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: খ (প্রভাতি)

দাদু বাড়ি ভ্রমণ

তখন ছিল বসন্তকাল। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। আমি, আমার ছোট ভাই, বাবা-মা, নানু, সেজো মামা, ছোট খালামনিসহ আমরা সবাই সেদিন রওনা হই আমার দাদুরবাড়ি বরগুনার উদ্দেশে। ফাল্গুনের দুপুরে আমরা সবাই লাঞ্চ শেষ করে গাড়িতে করে পৌঁছাই সদরঘাট। সেখানে গিয়ে বরগুনার লঞ্চ পায়রায় উঠি এবং বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে লঞ্চের দু'তলা কেবিনে পৌঁছেন। যখন ৪টা বেজে ৩০ মিনিট তখন হঠাৎ ভোঁ করে একটা শব্দ করে আমাদের লঞ্চ ছাড়ে বরগুনার উদ্দেশে।

লঞ্চ যখন সামনের দিকে চলতে শুরু করে তখন চারপাশের দৃশ্য এবং মনোরম পরিবেশ আমাকে আরও উৎফুল্ল করে তুলে। বাবা আমাকে লঞ্চের ছাদে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে নদী পাড়ের দৃশ্য, দূরে বৈঠা হাতে নৌকার মাঝি, নদীর মৃদু ঢেউ, সাদা গাঙচিল, মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে উঠা শুশুক দেখালেন। গোধূলি আলো পেরিয়ে যখন রাত ১০টা তখন দেখি চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেঘনার জলে। ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়। এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে যাই টেরই পাইনি। ভোরের আবছা অন্ধকার শেষে যখন আলো ফোটে আমরা তখন বিষখালি নদী পেরিয়ে গন্তব্যে এসে পৌঁছে গেছি। তাকিয়ে দেখি আমার আপনজনেরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। কী যে খুশি খুশি সবার মুখ। সঙ্গে আমরাও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই।

তারপর আমরা রিক্সা করে দাদু বাড়ি পৌঁছাই এবং পরদিন আবার নৌকায় চড়ি। নৌকার মাঝি আমাদেরকে অনেক দূর নিয়ে যায়। নৌকায় চড়তে আরেকটি অভিজ্ঞতা হয় আমার। জেলেরা কীভাবে মাছ ধরে সেই দৃশ্য দেখতে পাই। বাবা আমাকে বললেন, জেলেরা অনেক কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা অনেক সুবিধা বঞ্চিত। তবুও জীবন যুদ্ধে জয়ী। আরও দেখি গ্রামের মানুষজন একে অপরের কত আপন! খুব মিলেমিশে থাকে তারা।

দাদু বাড়ি এক সপ্তাহ ছিলাম আমরা। এমন অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন ঢাকার উদ্দেশ্যে লঞ্চে চড়ে বসি তখন দেখি আমার সকল দাদা ভাই এবং দাদুরা চোখ মুছতে মুছতে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। আমিও কাঁদি। আমাদের লঞ্চ ছেড়ে চলে আসে, আর দাদুরাও মিলিয়ে যান কোথাও।

আমি জীবনে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছি। কিন্তু আমার হৃদয় গহীনে এমন দাগ কাটেনি একটিও। আমি আবার যাবো, বার বার যাবো, আমার দাদুর বাড়ি; যেখানে মিশে আছে আমার অস্তিত্ব, আমার সমস্ত আবেগ আর ভালোবাসা।

মোহাম্মদ হোসায়েন
কলেজ নম্বর: ১৮৭৯৭
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ই (দিবা)

মাহরুম জিনান
কলেজ নম্বর: ১৮৭৮০
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

ভ্রমণ কাহিনি

আমার নানা বাড়ি ময়মনসিংহের গারো পাহাড় থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী থানায়। কখনো পাহাড় দেখা হয়নি। শুধু শুনেছি, কখনো যাওয়া হয়নি। একদিন মেঝো মামার ছুটি। হঠাৎ করে মামা বললেন আমাকে ও আমার বড় ভাই জাওয়াদকে, চলো ঘুরে আসি। মেঝো মামাকে বললাম কোথায় নিয়ে যাবে? উনি আমাদের কিছু না বলে একটা সিএনজি নিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা ইন্ডিয়ার বর্ডার নাকুগাঁও স্থলবন্দরে চলে গেলাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পাহাড় ঘেঁষে একটা নদী। দেখতেও অনেক সুন্দর, ছোট একটা নদী। অনেকে জাল ফেলে মাছ ধরছে।

আমরা কিছুক্ষণ সময় পার করে পানিহাটা তাড়ানি পাহাড় দেখতে চলে গেলাম। একটা পাহাড়ের উপর উঠে গির্জা এবং নদীর ওপারে ইন্ডিয়ার পাহাড়ের সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলাম। কি যে সুন্দর সেটা বলে বুঝাতে পারবো না। পাহাড়ের মাঝখানে একটা দোকানে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার বারমারী মিশন পাহাড় দেখতে বের হলাম। সেখানেও গিয়ে দেখি ছোট ছোট উঁচু নিচু পাহাড়। এই পারে বাংলাদেশ আর ওপারে ইন্ডিয়া। আমি পাহাড়ের টিলাতে উঠতে লাগলাম, অবলোকন করলাম সৌন্দর্য। আমি জঙ্গলে যেতে চাইলাম, আমার মেঝো মামার নিষেধে যেতে পারিনি। সারাদিন পাহাড় ভ্রমণ করে বিকেলের দিকে আবার নানার বাসায় ফিরে আসলাম ক্লান্ত দেহে।

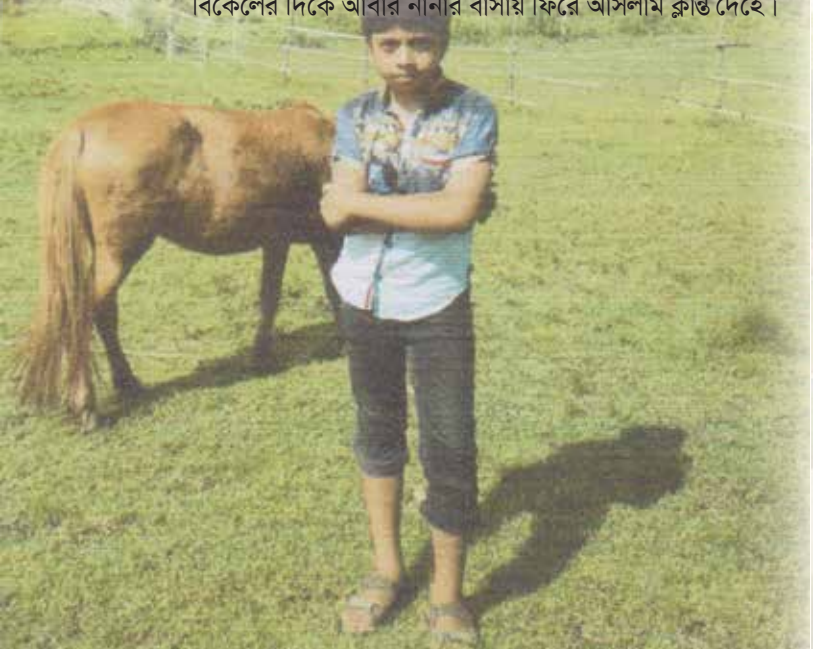

আমার স্কুলের প্রথম দিন

স্কুলে যাওয়ার জন্য আমি খুব অপেক্ষা করেছিলাম। যেদিন প্রথম স্কুলে গেলাম সেদিন খুব মজা পেলাম। সেই বড় বড় মাঠ। মাঠ দেখতে দেখতে শিক্ষা ভবন-২ এর সামনে গিয়ে দেখলাম, শিক্ষকেরা আমাদের জন্য রুম ঠিক করে রেখেছেন। রুমে গিয়ে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমাদের টিচার এর দেওয়া ক্যান্ডি, যেটার অনেক স্বাদ ছিল। তোমরাও হয়তো এই বড় স্কুলে পড়ে মজা পেতে। এ দিনটার কথা আমার সবসময় মনে থাকবে।

আয়ান রহমান
কলেজ নম্বর: ১৮৭৬৯
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ই (প্রভাতি)

সুন্দরবনের সুন্দর স্মৃতি

আমার দাদুর বাড়ি সাতক্ষিরা, সুন্দরবনের কাছাকাছি। আমি বাবা, মা, কাকা, কাকিদের সাথে সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়েছিলাম। বন অফিসের অনুমতি নিয়ে, কিছু টাকা জমা দিতে হয়। এরপর ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চড়ে ছোট ছোট নদীর ধার দিয়ে সবুজে ঘেরা সুন্দরবন। দেখতে অনেক সুন্দর। আমরা হরিণ, বানর ও নানা রঙের পাখি দেখেছি। জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখিনি, কিন্তু পায়ের ছাপ দেখেছি। এরা গভীর জঙ্গলে থাকে। এছাড়া সুন্দরবনে নানা ধরনের সাপ, নদীতে কুমির, ডলফিন ও অনেক ধরনের মাছ আছে। সুন্দরবনে সুন্দরী, গরান, কেওড়া ও গোলপাতা গাছ আছে। সুন্দরবনে মৌয়ালরা মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবন পরিবেশের অনেক উপকার করে। সুন্দরবনের সুন্দর স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

ফাইরুজ জাওয়াদ
কলেজ নম্বর: ১১২২২
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: গ (দিবা)

গোয়েন্দা কিশোর

কিশোর তার বন্ধুদের সাথে খেলছিলো। তখনই তার বন্ধু রাকিব এসে তাকে জানালো যে সামাউন আর সে নাকি তার দাদার পুরনো বাসায় গিয়েছিলো। কারণ, তাদের বন্ধুরা তাদের ভীতু বলে ডাকতো। কারণ তাদের ভূতের ভয় ছিলো। এজন্য তারা শর্ত রাখলো যে, তারা যদি রাকিবের দাদার পুরনো বাসায় এক রাত কাটাতে পারে তাহলে তাদের বন্ধুরা তাদেরকে আর ভীতু বলতে পারবে না।

তাই তারা সে বাড়িতে গেলো। কিন্তু লোকেরা বলতো যে সেখানে গেলে কেউ আর ফেরত আসে না। তারা যখন যাচ্ছিলো, অনেকে বলছিলো ..... সেখানে যেও না.....। তারা তাদের কথায় পাত্তা দিলো না।

তারা সেখানে ঢোকে, আর সামনের দিকে এগোতে থাকে। রাকিব হঠাৎ করে দেখে, সামাউন তার পিছনে নেই!!! তখন সে দৌড় দিয়ে সামাউনকে খোঁজে কিন্তু পায় না। তাই সে দৌড়ে কিশোরের কাছে আসে।

কিশোর বললো যে, চলো আমরা তাকে খুঁজতে যাই।

পরে কিশোর আর রাকিব সে বাড়িতে গেলো।

বাড়িতে ঢুকে তারা সামনে এগোতে লাগলো। তারা প্রথম তালায় খুঁজছিলো সামাউনকে, কিন্তু তারা সেখানে তাকে খুঁজে পেলো না। তাই তারা দোতলায় গেলো।

দোতলায় তারা একটা রুমের ভিতরে শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো। তারা ভাবলো, সেখানে হয়তো সামাউন আছে। তাই তারা সে রুমে ঢুকলো, আর দেখলো যে রাকিবের আংকেল ড্রয়ারে কিছু খুঁজছিলো। তখন রাকিব বললো, আংকেল আপনি এখানে কী করছেন? আংকেল তাদের দেখে চমকিত হলো। তিনি বললেন, "আমি তোমার বাবাকে ছোটবেলায় কিছু জিনিস দিয়েছিলাম। সেগুলো আছে কিনা তা দেখতে এসে ছিলাম আরকি। অনেকদিনে এই বাড়িতে আসা হয় না।"

হঠাৎ করে আংকেলের হাত থেকে একটা কাগজ পড়ে গেলো। কিশোরের পায়ের কাছে তা উড়ে আসলো। সে কাগজটা উঠিয়ে খুললো এবং সেটা এ বাড়ির মানচিত্র। যেখানে কয়েকটা ক্রশ দেওয়া আছে। আর, তার পাশে লেখা রয়েছে। "এখানে property নেই"। তখনি কিশোর বুঝে গেলো যে, লোকটা রাকিবের দাদার property চুরি করতে এসেছিলো। সে দেরি না করে তাড়াতাড়ি রাকিবকে বললো।

তখনি তার আংকেল বললো যে, এই ছেলেটা তো দেখি একটু বেশি বুদ্ধিমান। মানচিত্র দেখেই ঝট করে বুঝে ফেললো আমি এখানে কী করতে এসেছি। এই property টা নেয়ার জন্য আমি আরো আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনি তার property তোমার (রাকিবের দিকে তাকিয়ে) বাবাকে দিতে চেয়েছিল। এজন্য আমি তাকে আগেই খুন করি যাতে property টা তোমার বাবাকে দিতে না পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তোমার দাদি তা দেখে ফেলে। এজন্য আমাকে তাকেও খুন করতে হয়। আর তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে এ বাড়িতে একবার আসলে আর ফেরত যায় না। কারণ তারা আমার সত্যিটা জেনে যায়। এইজন্য আমি তাদেরকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আটকে রাখতাম। ওখানে অনেক ধরনের বিষাক্ত সাপ, মাকড়সা আছে। আমি অবশ্য একবার ওদের ওখানে আটকানোর পর আর তেমন খোঁজখবর রাখি না।

"তাহলে তোমরা যখন জেনেই গিয়েছো, তোমাদেরও আর এভাবে মুক্ত রেখে কি লাভ?"

তখনি রাকিব আর কিশোর তার মতলব বুঝতে পেরে দৌড় দিলো। তারা পালাতে থাকলো। রাকিব একটার পর একটা জিনিস যা হাতের কাছে পাচ্ছিলো ছুঁড়ে মারছিলো। তখনই কিশোর একটা দরজা খেয়াল করলো। রাকিব বললো এটি চার তলার সিঁড়ির দরজা। কিশোর নব ঘুরিয়ে দেখলো যে সেটা আটকানো। রাকিব তার পকেট থেকে একটি চাবি বের করে তা দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো। সেখানে কিশোর দৌড়াতে দৌড়াতে রাকিবকে জিজ্ঞেস করলো যে এই চাবিটা তার কাছে কোথা থেকে এলো। রাকিব বললো চাবিটা তাকে তার বাবা দিয়েছিলো।

দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের সামনে একটা ওয়াল পড়লো। রাস্তা বন্ধ!! এবার তো তারা ফেসে গেলো। তারা শুনতে পেলো আংকেলের পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে আংকেল তাদের সামনে এসে পড়লো। তার হাতে একটা লম্বা এবং মোটা লাঠি ছিলো। তখনি আংকেলের হাতে কে যেন একটি লাথি মারলো। সাথে সাথে আংকেল ব্যথায় গুঙ্গিয়ে উঠলেন। তার হাত থেকে লাঠিটা পড়ে গেল । আর তা কিশোরের সামনে এসে পড়লো। তারা দেখলো যে ব্যক্তি লাথি মেরেছে ঐ ব্যক্তি আর কেউ না, সেই সামাউন!!! আংকেলের মুখ কুঁচকে সামাউনকে ঘুষি মারতে গেলো। ঠিক তখনি কিশোর বিদ্যুৎ বেগে

লাঠিটা তুলে নিয়ে আংকেলের মাথায় একটা কষে আঘাত করলো। সইতে না পেরে তাদের আংকেল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

সামাউন তার ব্যাগ থেকে দড়ি বের করে তার আংকেলের হাত-পা বেঁধে দিল।

তখন রাকিব বললো যে ছোট বেলায় তার দাদা তাকে বলেছিলো যে চারতলার সামনে হাঁটতে গেলে তুমি একটি ওয়াল দেখবে। ঐ ওয়ালে যে বড় ছবিটা আছে তা তুমি সরালে একটা চমক পাবে। আমি তখনি কাজটা করতে চাইলেও দাদা আমাকে করতে দেয়নি। তিনি বলেছিলেন, "আমি কাজটা বড় হলেই করতে পারবো।"

তারপর কিশোর লক্ষ করলো যে তারা চার-তলাতেই আছে। সে চারপাশে তাকিয়ে একটি ধুলোয় ভরা ছবি লক্ষ করলো। সে তার কাছে গিয়ে ছবিটা সরিয়ে দেখলো।

যেখানে একটা ধাতব দেয়ালের মতো কিছু লক্ষ করলো। একটু পাশে একটা ধাঁধার মতো কিছুও সে দেখতে পেলো। এই ধরনের জিনিস তার খুব পছন্দ। সে মুহূর্তের মধ্যে ধাঁধাটা সমাধান করে। ফেললো। এরপর একটা নবের মতো কিছু উদয় হলো। সে ঐ নবটা ঘুরিয়ে খট শব্দ করে ধাতব দেয়াল খুলে ফেললো। রাকিব আর সামাউন তা দেখে খুবই অবাক হলো। কিশোর সেখানে একটা কমলা রঙের ফাইল দেখতে পেলো। ফাইলটা বের করে সে খুলে দেখলো যে সেটা আসলে এই বাড়িটির দলিল। দলিলের কাগজটা সে রাকিবকে দিলো। এরপর তারা তিনজন কোনোমতে বাড়িটা থেকে বের হয়ে পুলিশ ডেকে আনলো।

তাদের আংকেলকে গ্রেফতার করা হলো। আর রাকিব সে দলিলটা তার বাবাকে দিয়ে দিলো। রাকিবের বাবা তাদের প্রতি অনেক খুশি হলো। পুরস্কার হিসেবে তিনি তাদেরকে নিয়ে ভালো একটা জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। এই কথা শুনে তারা তিনজন আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

মুস্তাকিম সামিউল হক
কলেজ নং: ১১২১১
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: গ (দিবা)

রহস্যময় শহর অয়মিয়াকন

অয়মিয়াকন এমন একটি শহর যে শহরে বসবাস করার চেয়ে আপনার বাড়ির ডিপ ফ্রিজে বসবাস করাও অনেক আরামদায়ক। কারণ, সাধারণত ডিপ ফ্রিজের তাপমাত্রা -১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর অয়মিয়াকনে শীতকালে স্বাভাবিক তাপমাত্রা -৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে আপনার চোখের পাতা বরফ হয়ে যাবে নিমিষেই। এখানকার তাপমাত্রা এতই ঠাণ্ডা যে ফুটন্ত গরম পানি আকাশের দিকে ছুড়লে মাটিতে পড়ার আগেই তা বরফ হয়ে যায়। সেন্ট্রাল সাইবেরিয়ার এই ছোট্ট নগরের নাম অয়মিয়াকন। অয়মিয়াকন নদীর নামে এর নামকরণ করা হয়। সাইবেরিয়ান আঞ্চলিক ভাষায় অয়মিয়াকন অর্থ Unforzen Water। এখানে শুধু হাড়হিম করা ঠাণ্ডাই নয় অনেক দুর্গমও বটে।

অয়মিয়াকনের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর থেকে এখানে আসতে সময় লাগে টানা দুই দিন দুই রাত। সোভিয়েত শ্রমিকেরা এই রাস্তা তৈরি করেন। চরম প্রতিকূল আবহাওয়ায় রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি লোক মারা গেছে। কাজ করতে করতে যারা মারা গেছে তাদের রাস্তার মধ্যেই সমাহিত করা হয়। তাই এই রাস্তাকে বলা হয় Road of Bones। শীতকালে এখানে খাবার আর পানির কষ্ট বেশি। তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ঘোড়ার মাংস। এখানে কোনো পানির সরবরাহ নেই। তারা বরফ গলিয়ে পানি পান করে। অয়মিয়াকনে গ্রীষ্মকালে দিনের দৈর্ঘ্য হয় ২১ ঘণ্টা আর শীতকালে মাত্র ৩ ঘণ্টা। সে সময় তাপমাত্রা -৫৫ ডিগ্রির নিচে নামলে স্থানীয় বাসিন্দারা খুব অসুবিধায় পড়েন। কারণ এ সময় Frostibite হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

Frostibite মানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরের অনাবৃত কোনো স্থানের রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া। এখানকার শীতের আরেকটি উদাহরণ হলো কোনো ফল জমে এত শক্ত হয়ে যায় যা খাওয়ার উপযোগী নয়। শীতের জমে যাওয়া কলা দিয়ে হাতুড়ির মতো কাজ করা যায় অনায়াসে। অয়মিয়াকনে ১৭২০ সালে -৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। গরমকালেও এখানে বাস করা সহজ নয়। জুন ও জুলাই মাসে এখানকার বরফ গলে বাজে অবস্থা হয়। এখানকার তাপমাত্রায় সর্বনিম্ন -১০ ও সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। একবার কল্পনা করুন এ জায়গায় কিভাবে এত কষ্টে মানুষগুলো জীবনযাপন করছে।

Oymyakon Russia Coldest Inhabited Place

তানজিল ইসলাম
কলেজ নং: ১৬০৭৮
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: বি (প্রভাতি)

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের অজানা পাঁচ

বিশ্বে গোয়েন্দা সাহিত্যে যত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে শার্লক হোমস যে সব চরিত্রের উর্ধ্বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালি কিশোরদের প্রিয় গোয়েন্দা ফেলুদা লন্ডনে ২২১/বি, বেকার স্ট্রিটের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "গুরু তুমি ছিলে বলেই আজ আমার লন্ডন আসা সার্থক হলো"। এই গুরু যে শার্লক হোমস সেটা আর বলে দিতে হয় না। কারণ সব গোয়েন্দা চরিত্রের মূলেই যে রয়েছে এই শার্লক হোমস। সাংঘাতিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অপরাধী ধরার কৌশল, এমনকি ফেলে দেওয়া সিগারেট ও সিগারেটের প্যাকেট এবং মক্কেলের বিবরণ থেকেই রহস্যের সমাধান করে ফেলা একমাত্র শার্লক হোমসের পক্ষেই সম্ভব। আর এই বিশ্বখ্যাত চরিত্রের স্রষ্টা হলেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। ১৮৫৯ সালে ২ মে স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্ম হয় এই প্রখ্যাত লেখকের। শিক্ষাজীবনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ বিজ্ঞানের উপর পড়াশোনা করলেও ভেষজ বিজ্ঞানে অনাগ্রহের কারণে একসময় তা ছেড়ে মনোযোগ দেন সাহিত্যে এবং শুরু করেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের। নিচে তার সম্পর্কে পাঁচটি অজানা তথ্য দেওয়া হলো।

জাদুতে বিশ্বাস করতেন কোনান ডয়েল:

শিরোনাম দেখে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই। সত্যিই জাদু বিদ্যায় বিশ্বাস করতেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। সে সময়কার বিখ্যাত জাদুকর ছিলেন হ্যারি হুডিনি। তার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক খেলা ছিল হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিলেও তার থেকে বের হয়ে আসা। যাই হোক, জাদুর মূলে রয়েছে কৌশল ও ফাঁকিবাজি। ব্যাপারটা স্বীকার করেছিলেন স্বয়ং হ্যারি হুডিনিও। কিন্তু ডয়েল বিশ্বাস করতেন জাদুতে সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ থাকে। এমনকি স্রেফ এই বিশ্বাস নিয়েই দীর্ঘদিনের বন্ধু হ্যারি হুডিনির সঙ্গে বিচ্ছেদও ঘটিয়েছিলেন। ডয়েলকে সবাই চিনে সাহিত্যিক হিসেবেই। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো তিনি ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তার প্রসার তেমন জমেনি। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করার পরে পুরোপুরি সাহিত্যে মনোযোগ দিলেও পাশাপাশি ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। কিন্তু প্রসার তেমন জমলো না। তাই তিনি শুরু করলেন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা। ভালোমত পড়াশোনাও শেষ করলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, লন্ডনে তার চোখের ডাক্তারির চেম্বারে আসেননি একজন রোগীও।

নিজের তৈরি চরিত্রকে নিজেই মেরে ফেলেছিলেন :

একঘেয়েমি ব্যাপারটা সবার মধ্যেই রয়েছে। একই কাজ বারবার করতে কার না ভালো লাগে। একই ব্যাপার ঘটেছে ডয়েলের ক্ষেত্রেও। যে চরিত্রের জন্যই আজ তাঁর এত খ্যাতি, সেই শার্লক হোমসকেই মেরে ফেলছিলেন তিনি এই একঘেয়েমিতার কারণে। অবশ্য আরো একটি কারণ ছিল এই মেরে ফেলার পিছনে। গোয়েন্দা সাহিত্যে মনোযোগ দিলেও আসলে তিনি হতে চেয়েছিলেন একজন ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কটের মত। কিন্তু একসময় তার খেয়াল হলো শার্লক হোমস লিখতে গিয়ে অন্য কিছু লেখার সময়ই পাচ্ছেন না। তার যে ইচ্ছা ঔপন্যাসিক হওয়ার সেটি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মেরে ফেলবেন শার্লক হোমসকে। পরিকল্পনামত "দ্যা ফাইনাল প্রবলেম" গল্পে রাখাইনবাক জলপ্রপাত থেকে মেরে ফেলবেন শার্লক হোমসকে। কিন্তু কাজ হলো না। পাঠকদের তীব্র আন্দোলনে আবার লিখতে হলো শার্লক হোমস। অবাক করা বিষয় হলো, এই আন্দোলনে স্বয়ং ডয়েলের মাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নাইটহুড উপাধি পেয়েছিলেন যে কারণে :

১৯০২ সালে ব্রিটেনের রানির পক্ষ থেকে 'নাইটহুড' উপাধি লাভ করেছিলেন ডয়েল। অনেকের ধারণা অমর কীর্তি শার্লক হোমসের কারণেই তাঁকে 'নাইটহুড' উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু না তাকে 'নাইটহুড' উপাধি দেওয়া হয় সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধে আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা দেওয়ায়।

করেছেন গোয়েন্দাগিরিও :

ডয়েলের জীবনের আরেকটি আকর্ষণ হলো গোয়েন্দাগিরি করা। অবশ্য সেটা শুধু দুবারের জন্য। এগুলোর জন্য তিনি কোনো ফি বা পারিশ্রমিক নেননি, স্রেফ শখের বশেই করেছিলেন। প্রথমটাতে বাঁচিয়েছিলেন জর্জ এডালজি নামের এক ভদ্রলোককে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল পশু নির্যাতনের। পরে ডয়েল প্রমাণসহ দেখিয়ে দিলেন, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো তোলা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন এবং আসল অপরাধীকেও ধরিয়ে দেন। দ্বিতীয়বারও বাঁচিয়েছিলেন একজন ভুক্তভোগীকে। তার নাম ছিলো প্ল্যাটার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল এক মহিলাকে খুন করার। প্রমাণসহ আসল অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন ডয়েল। ফলে বেঁচে গিয়েছিলেন প্ল্যাটার। বিশ্বের তখনকার দিনের শার্লক হোমসের প্রতিটি ভক্তকে শোকে ভাসিয়ে ১৯৩০ সালে ৭ জুলাই হৃদযন্ত্রের ব্যথায় নিজ বাগান থেকে পরপারে পাড়ি জমান। পরপারে তিনি চলে গেলে কী হবে, তাঁর অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা চরিত্র "শার্লক হোমস" এর কারণে যে আজও তিনি রয়ে গেছেন প্রতিটি "শার্লক হোমস" ভক্তের হৃদয়ে।

আয়ান মাশরুর খান
কলেজ নং: ১০২৮৮
শ্রেণি: ষষ্ঠ , শাখা: খ (দিবা)

মুজিবনগর

বিশাল এক বাগান। বাগান বললে ভুল হবে, ঘন জঙ্গল বলা যেতে পারে। চারিদিকে বিশাল আম গাছ। এত মানুষ যে পুরো এলাকা একটা গমগমে ভাব। কিছু বিদেশি সাংবাদিক গোপনে আসল। বিশাল এক আম গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে তোরণ। তোরণে লেখা "Welcome Joy Bangla" স্বাগতম জয় বাংলা। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সদ্য জন্ম নেওয়া মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী), এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ পুনর্বাসনমন্ত্রী) প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ।

"তোমার নেতা আমার নেতা"
শেখ মুজিব ! শেখ মুজিব !
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো
জয় বাংলা !"

সবার মুখে স্পষ্ট যে, জীবন দিয়ে হলেও এ দেশ স্বাধীন করতে হবে। তারা সকলে সর্বস্ব দিয়ে লড়তে প্রস্তুত, যা তাদের মুখে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। হ্যাঁ, বলছি মেহেরপুরের মুজিবনগরের আমবাগানের ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এর কথা। এবার বর্তমানে আসা যাক। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মুজিবনগর (তৎকালীন বৈদ্যনাথ তলায়) দাঁড়িয়ে আমার দেখা সেইসব স্মৃতি ভাসছে আমার চোখের সামনে। মনে হচ্ছে, আমিও যেন ৪৯ বছর আগের দিনটিতে ফিরে গেছি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হওয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ, তার কারাগারে থাকার সময় তার অবর্তমানে তাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে গঠিত হয় মহান মুজিবনগর সরকার যা বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই সরকারের সঠিক নেতৃত্বে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় দল-মত নির্বিশেষে সকল পেশাজীবীর সহায়তায় বাঙালি একসাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনীর এ দেশ স্বাধীন হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগমনে এই স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়। তাছাড়া সেখানকার স্মৃতিসৌধ তাদের অসামান্য অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতিসৌধের মাঝখানে চারকোণা বিশিষ্ট লাল মঞ্চ যা সূর্য এর মত দেখতে। যেন মনে হয়, নতুন একটি সূর্য চারিদিকে তার কিরণ ছড়াচ্ছে। এর চার পাশে ডানে বামে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাছাড়া নতুন করে তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা স্মৃতি জড়িত ভাস্কর্য। যেমন- বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী কর্তৃক ঘরে আগুন দেওয়া, বধ্যভূমিতে হত্যা করা, চার নেতাসহ ইত্যাদি ঘটনার বা ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য। একটি মঞ্চের মত চারিদিক দিয়ে ঘেরা (অনেকটা স্টেডিয়ামের আকৃতি) এর ভিতরে রয়েছে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্র। সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার থেকে পুরো বাংলাদেশকে খুব সুন্দর করে দেখা যায়। নিজেকে আমার এত ভাগ্যবান মনে হয় যে, আমার এই মহান স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

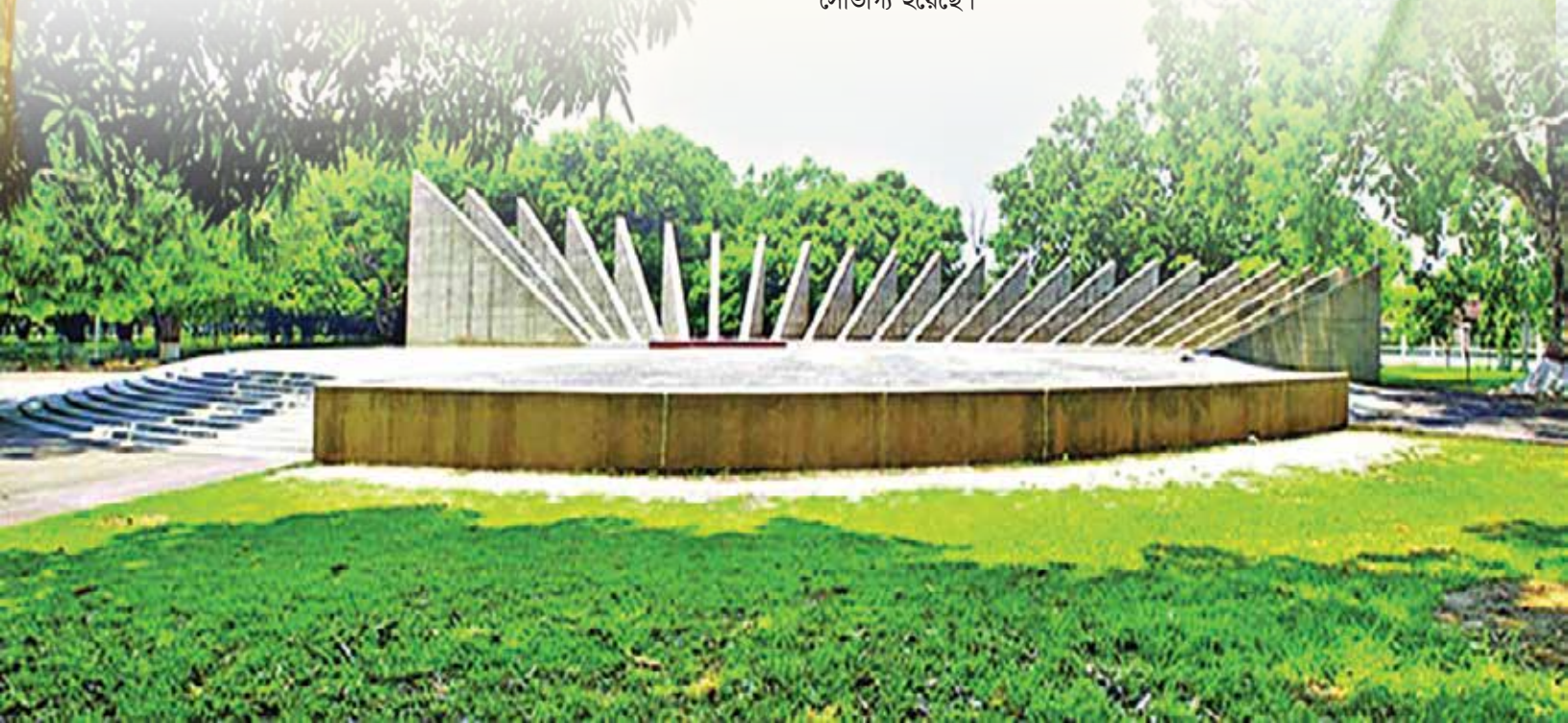

আবিদ হাসান আহনাফ
কলেজ নম্বর: ১৮৫৯৮
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

লীপু স্যারের সাথে একদিন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জয়নুল আবেদিন হাউজে থাকি। আমার ছোটবেলা থেকেই গাড়ির প্রতি দুর্বলতা আছে বিশেষ করে রেসিং কার: ল্যামবঘিনি, ফেরারি, ল্যান্সার, মিটসুবিসি, টেলসা ইত্যাদি। কখনো ভাবিনি ফেরারি গাড়ি তৈরির ইঞ্জিনিয়ার, ডিজাইনার, কোচ বিল্ডার নিজামউদ্দিন আওলিয়া লিপু স্যারের সাথে দেখা হবে। আমার মা যদিও আমাকে একদিন ফোনে লিপু স্যারের সম্বন্ধে জানিয়েছিল। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি কত বড় বিস্ময়কর ঘটনা অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। ১৬ই নভেম্বরের কথা, ঘুম থেকে উঠে যথারীতি আমি আমার কাজ করছিলাম। সকাল ১০:২৮ এ আমরা যখন টিফিন খাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে ক্লাস সেভেনের কৌশিক ভাই আমাকে এসে বলল 'তুই যাবি না?' 'আমি বললাম,' কোথায় যাবো? 'ভাইয়া বলল,' তোর নাম আবিদ না? তোর নাম লিস্টে আছে।

এই কথা শুনে আমি ইউনিফর্ম পরে ছুটে চলে গেলাম শিক্ষা ভবন তিন এর দিকে। আগে থেকেই লিপু স্যারের জন্য অপেক্ষা করছিল অনেকেই। আমিও তাদের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ১১:৩০ এর দিকে লিপু স্যার আসলেন। সাথে প্রিন্সিপাল স্যার এবং অন্যান্য স্যারেরাও ছিলো। লিপু স্যার আমাদের সাথে অনেক গল্প করলেন। জানালেন গাড়ি তৈরির নানা অভিজ্ঞতার কথা। কোন গাড়ির মডেল কল্পনা বা আঁকার সাথে সাথে তা তৈরি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি গাড়ি তৈরির কাজটি শেষ করতে চাইতেন। ডিসকভারি চ্যানেল তাকে প্রস্তাব দেয়, দুই মাসে দুটি গাড়ি তৈরি করে দিতে। যেখানে একটি গাড়ি তৈরি করতে সময় লাগে ১ বছর! সেখানে তাকে চ্যালেঞ্জ করে এক মাসে একটি গাড়ি তৈরি করে দিতে। তিনি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলেন এবং তাতে তিনি সফলতার সাথে জয়ী হলেন। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি। তার এ সকল গাড়ি বানানো দেখে আমিও অনুপ্রেরণা পাই। আমি আগে থেকেই লোগো দিয়ে নানা ধরনের গাড়ি তৈরি করতাম। বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকৃতির বা ডিজাইনের লোগোর তৈরির গাড়ি বানিয়ে থাকি। আমি প্রায় ৩৬ ধরনের লোগো দিয়ে গাড়ি তৈরি করছিলাম। আমার মন বলছিলো যে, 'ইনশাআল্লা' আমি এই স্মৃতিটি কোন দিন ভুলতে পারব না আজ আমার এবং লিপু স্যারের সাথে প্রথম দেখা। আশাকরি, আবার যেন উনার সাথে দেখা হয় বিশ্ববিখ্যাত গাড়ি তৈরির ডিজাইনার হিসেবে।

মাহির জামান চৌধুরী
কলেজ নম্বর: ৯৪৮৯
শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: খ (দিবা)

অন্ধকার জগৎ

আমাদের গ্রামের কছির শেখ নিতান্তই দিনমজুর। সকাল বেলা বেরিয়েছে শহরের পথে, দুধ বেচতে। বেড়াতে বেড়াতে আমিও তার সঙ্গ নিয়েছিলাম। আমার বয়স তখন খুব কম। কিন্তু তা হলেও আমি স্কুলে পড়ি। আর কছির শেখ জীবনে কখনও ছাপার হরফে চোখ বোলায়নি, পেনসিল দিয়ে কাগজের পাতায় দাগ কাটেননি কোনোদিন। এই আমার কাছে সে অনেক কিছু জানতে চায়, জিজ্ঞেস করে। নানান অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন। অথচ বিজ্ঞানের নিতান্তই সহজ কথাগুলোও কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না তাকে।

পৃথিবী যে গোল তার যতগুলো প্রমাণ স্কুলের বইয়ে পড়া ছিল, খুব সোজা করে সব একে একে বললাম তাকে। বয়স আর দুঃখ ভারে জরাজীর্ণ ভাবলেশ শূন্য মুখে সে শুধু চুপ করে শুনে গেল। বললাম, "ঐ যে সূর্যটা, দেখতে গনগনে আগুনের গোলার মতো, ওটা হচ্ছে একটা ছোট খাটো তারা আর ওটা আছে আমাদের পৃথিবী থেকে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে।" গোলার থালার মতো গোল ওই বিরাট সূর্যটা আবার ছোটখাটো তারা কী রকম? বললাম , "আজ যদি পৃথিবীর থেকে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ট্রেন ছাড়া যায় তবে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা একটানা বরাবর চলেও তাঁর কাছে গিয়ে পৌছাতে দু'শো বছর পেরিয়ে যাবে।

কছির শেখ যখন শুনল ওই গনগনে সূর্য আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে না, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে, তখন সে দস্তুর মতো অবাক হয়। পৃথিবী যদি গোল হয় তবে আমরা পড়ে যাইনা কেন? পৃথিবী যদি শূন্যের ওপর দিয়ে ঘুরে, তাহলে আমরা তা একেবারে বুঝতে পারিনা কেন? ততক্ষণে মাঠের পথ পেরিয়ে আমরা বাঁধানো সড়কে এসে পড়েছি। সড়কের মাঝখানে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং, আড়াআড়ি ভাবে সড়ক ডিঙিয়ে রেল লাইন পাতা; সেখান দিয়ে আমাদের সামনেই হুস হুস করে একটি ট্রেন বেরিয়ে গেল। শেষকালে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই রেলগাড়ি দিয়েই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি। রেলগাড়িতে বসে জানালা দিয়েই দূরে তাকালে মনে হবে, আমরা বুঝি স্থির আছি, বাইরের গাছপালা বাড়িঘরগুলোই আমাদের ফেলে দৌড়াচ্ছে পেছনের দিকে। পৃথিবীর বেলাতে ঠিক তেমনি। পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে চারদিকে ঘুরছে পূর্বের দিকে অথচ আমরা দেখি ঠিক তার উল্টোটি, যেন সূর্যই পৃথিবীর চারাধারে ঘুরছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে।"

কিন্তু এত সব কথা আমি শোনাচ্ছি কাকে? কছির শেখ তো জীবনে কোনোদিন রেলগাড়িতে চড়েন নি। সে জিজ্ঞেস করে, "রেলগাড়ির মতো বিরাট দৈত্যটা কী করে চলে?" আমি বুঝালাম,"আগুনে পানি গরম করলে যে বাষ্প তৈরি হয় তার বিরাট শক্তিতে রেল চলে, জাহাজ চলে, কত বড় বড় কলকারখানা চলে।

এমন সোজা ব্যাপারগুলো তাকে বোঝাতে না পারায় সত্যি বলতে কি, দুঃখে আমার কান্না পায়। এতক্ষণ কী ভাবল সে? সে ভাবল যে এই ইংরেজি পড়া ছেলেগুলো যে আরেক দুনিয়ার মানব। সেখানে পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোল, পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘোরে, সূর্য একটা ছোটখাটো তারা, সেখানে বাষ্পের শক্তিতে হরেক রকম কল চলে। একদম আলাদা জগৎ সেটা।

আমার ছোটবেলার চেনা সেই কছির শেখ আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু আজও এমনি হাজার হাজার লাখ লাখ কছির শেখ ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে। আমাদের আশেপাশে চারপাশে।

তাদের চোখে শিক্ষা আর সভ্যতার আলো পৌঁছাতে পারিনি আমরা। বিজ্ঞানের দান তাদের জীবনে আনেনি কোনো আশীর্বাদ। তাদের চোখে এখনো অন্ধকার এই অন্ধকার আমাদের চারপাশের এই দুনিয়ারই অন্ধকার।

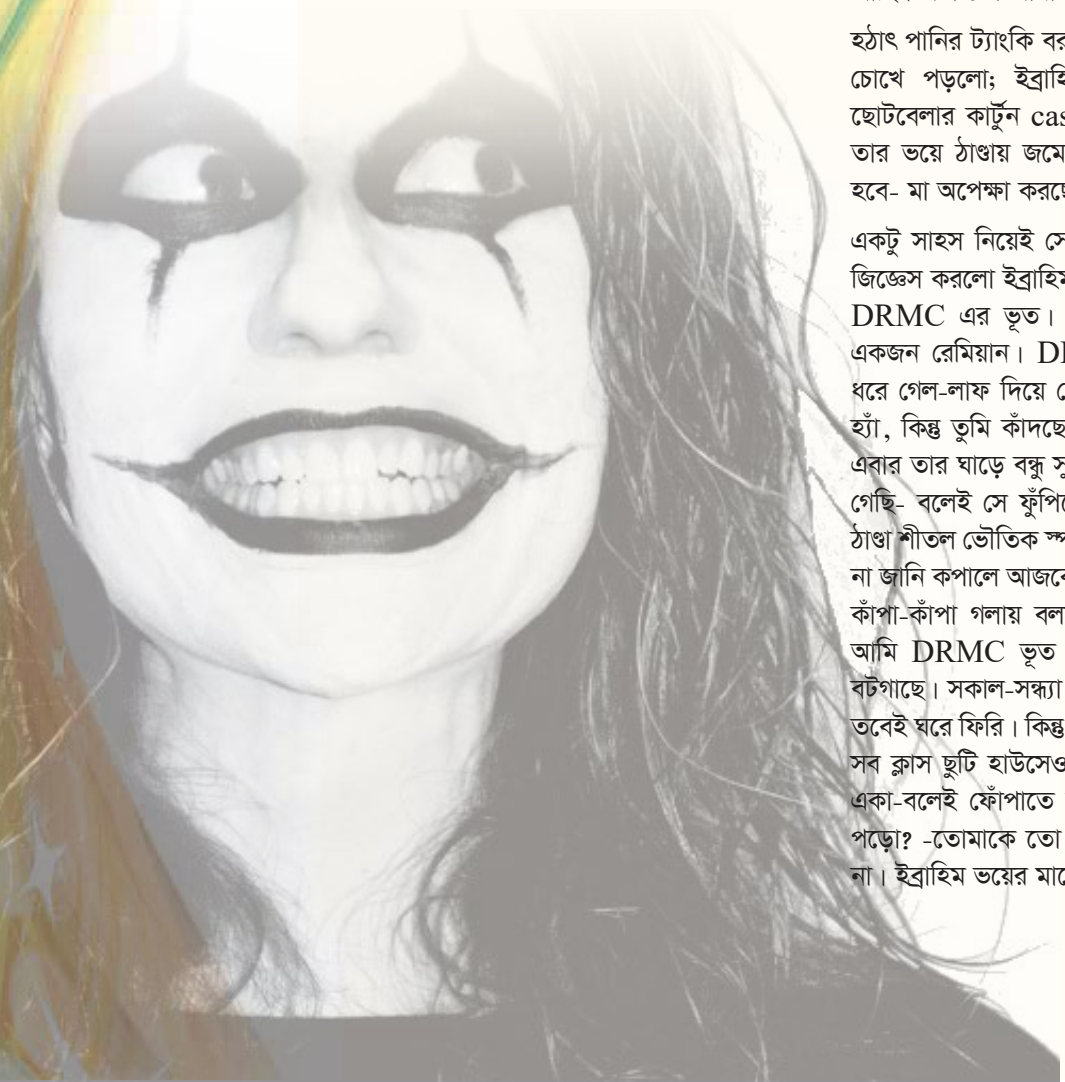

আব্দুর নুর খান ওয়াসি
কলেজ নম্বর: ১৫২০০২২
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (দিবা)

এক রেমিয়ান ও DRMC ভূত

রাত ১১টার কিছু বেশি। ইব্রাহিম তার বন্ধুর একটা গাড়ি থেকে গণভবনের উল্টো পাশে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের কোনায় নেমে পড়ল। ডিসেম্বরের শেষ প্রান্ত, রাতের অন্ধকারে রাস্তাঘাট একদম খালি, শীতের হিমহিম ঠাণ্ডা বাতাসে বয়ে যাচ্ছে। ইব্রাহিমের একটু ভয় ভয় লাগছে। আজ ওয়ার্কশপ শেষ করে, টিউশনিতে পড়িয়ে বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে গেল। হঠাৎ গুনগুন করে চাপা কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ইব্রাহিমের হৃদস্পন্দন আরো বেড়ে গেল। নিজেকে সে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, "ভয় কিসের, আমিতো DRMC'র সীমানাতেই আছি। এটা তো আমারই স্কুল-কলেজ, আমার পৃথিবী।"

হঠাৎ পানির ট্যাংকি বরাবর ওয়ালের উপর সাদা কি যেন একটা চোখে পড়লো; ইব্রাহিম চোখ দুটো রগরে নিলো-এই যে ছোটবেলার কার্টুন casper এর মতো কিছু একটা। পা দুটো তার ভয়ে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। কিন্তু বাসায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে- মা অপেক্ষা করছে।

একটু সাহস নিয়েই সে এগিয়ে গেলো। -কে তুমি? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো ইব্রাহিম। হঠাৎ কান্না থামিয়ে সে বললো, আমি DRMC এর ভূত। কিন্তু তুমি কে? আমি? আমি ইব্রাহিম, একজন রেমিয়ান। DRMC ভুতের প্রাণে আনন্দের জোয়ার ধরে গেল-লাফ দিয়ে সে নিচে নেমে এলো, তুমি রেমিয়ান!!! হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন? জিজ্ঞেস করলো ইব্রাহিম। ভূত এবার তার ঘাড়ে বন্ধু সুলভ হাত রেখে বললো- আমি একা হয়ে গেছি- বলেই সে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিল। ঘাড়ের উপর ঠাণ্ডা শীতল ভৌতিক স্পর্শ ইব্রাহিমকে আরো ভীত করে তুললো, না জানি কপালে আজকে কী আছে মনে মনে ভাবে সে। ইব্রাহিম কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো-বুঝলাম না। ভূত বলতে লাগলো, আমি DRMC ভূত। থাকি ২ নম্বর শিক্ষা ভবনের সামনে বটগাছে। সকাল-সন্ধ্যা সারাদিন ছাত্রদের সাথে হৈ হুল্লোর করে তবেই ঘরে ফিরি। কিন্তু এখন তো ফাইনাল পরীক্ষা শেষ, কলেজ সব ক্লাস ছুটি হাউসেও বন্ধুরা নেই। তাই আমি একা, একদম একা-বলেই ফোঁপাতে লাগলো সে। আচ্ছা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? -তোমাকে তো গত ২/১ বছরে দেখছি বলে মনে পড়ে না। ইব্রাহিম ভয়ের মাঝেও আঁতকে উঠলো- তুমি এখানে

সবাইকে চেন? হ্যাঁ, এ কলেজের প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষক, স্টাফ এমনকি গাছ, ফুল, মাটি, ঘাস সব আমার চেনা। কই বললে নাতো নিজের কথা! ইব্রাহিম এবার ভয় কাটিয়ে বলতে লাগলো, আমি ইব্রাহিম, প্রাক্তন রেমিয়ান। বছর দুই হলো কলেজ থেকে বেরিয়েছি এখন পড়ছি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। ও... আচ্ছা! ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলো, তুমি পড়াশোনা কর? মুখ কাচুমাচু করে ভূত বললো। ওটাই তো পারি না। অনেক চেষ্টা করছি- এজন্যই তো মা এখানে বসত গড়েছে, সারাদিন আমাকে বকে। অংকটা যেন কিছুতেই মাথায় ঢুকেনা। কিন্তু আমি ভালো খেলোয়াড়। ছেলেরা টিফিন টাইমে যে খেলা করে আমিও ওদের সাথে খেলি। ক্রিকেট খেলার সময় ওরা ছক্কা মারলে আমিই তো বাউন্ডারি পাড় করে দিই। কেন, গতবার DRMC যখন ফুটবলে Inter College Tournament জিতে ছিলো, গোলটা আমিই দিয়েছিলাম। ইব্রাহিম এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! মনে মনে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললো। কেননা, সে নিজেও ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলো। কিন্তু এখন মনের মধ্যে খুঁতখুঁতে ভাব হচ্ছে- গোলগুলো কি তার নিজের, না DRMC ভূতের!!

আচ্ছা ইবু, ই....ই..... ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কি DRMC চেয়েও বড়? ওখানকার ছাত্র-শিক্ষক কি এখানকার মত? ইব্রাহিমের চোখে পানি এসে গেল- কি যে বলনা ভূত? কোথায় DRMC। কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি। আমি সেই ক্লাস থ্রি থেকে। এখানে আমার দ্বিতীয় মা, এখানকার মাটি, গাছপালা, মাঠ, ক্লাসরুম আমার সেকেন্ড হোম। DRMC এর সাথে কারো তুলনাই চলে না। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠলো, মনে হয় মা ফোন করেছে। ইব্রাহিম মোবাইল Screen এ মায়ের ছবিটা দেখলো। বললো রাত ১২টা বাজে। ঘরে যেতে হবে। তুমি মন খারাপ করো না ভূত। আর মাত্র কয়েকটা দিন। স্কুল খুব শীঘ্রই খুলে যাবে। ১লা জানুয়ারি নতুন বই দিবস। হুম ভেজা চোখে ভূত বললে, তোমার সাথে আলাপ করে অনেক ভালো লাগলো ইবু রেমিয়ান। আমারও বিদায় নিতে হবে,বলল DRMC ভূত। হঠাৎ পিছু ডাকে ইব্রাহিম ফিরে তাকালো- ভালো থেকো রেমিয়ান- আমার কথা মনে রেখো। আর যেখানে থাকো, যেভাবেই থাকো, রেমিয়ানদের সম্মান বজায় রেখো।

শাখাওয়াত হোসেন
কলেজ নং: ১৮৬১২
শ্রেণি: নবম, শাখা: গ (প্রভাতি)

ফজলুর রহমান খান ও আধুনিক অট্টালিকার জনক

আধুনিক সভ্যতার এক অনন্য নিদর্শন হলো স্কাইপোরস বা আকাশচুম্বী অট্টালিকা। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে টেকসই ও সাশ্রয়ী আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন একজন বাঙালি। তাঁর নাম ফজলুর রহমান খান। বিশ্বব্যাপী তিনি এফ আর খান নামে পরিচিত। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন হিসেবে পরিচিত ছিল সিয়ার্স টাওয়ার। ফজলুর রহমান খানের আবিষ্কৃত 'টিউব স্ট্রাকচার সিস্টেম' এর কারণেই ১১০ তলা বিশিষ্ট এ ভবনটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে নিউইয়র্কের World Trade Center, মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস, টুইন টাওয়ার থেকে শুরু করে বর্তমান কালের সর্বোচ্চ অট্টালিকা বুর্জ খলিফাও এফ আর খান এর আবিষ্কৃত 'টিউব স্ট্রাকচার সিস্টেম' পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। তিনি পুরো মানব সভ্যতা বদলে দিয়েছিলেন এজন্য তাকে বলা হয় "Einstein of stuctural Engineering"।

ফজলুর রহমান খান ১৯২৯ সালের ৩ এপ্রিল মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত নির্মিত প্রায় সকল আকাশচুম্বী ভবন তাঁর 'টিউব স্ট্রাকচারাল সিস্টেম' অনুসরণ করেই বানানো। ১৯৬০-৭০ সালের মধ্যেই এফ আর খান বিখ্যাত হয়ে যান। তাই এফ আর খানকে আধুনিক অট্টালিকার জনক বলা হয়।

আশিকুর রহমান প্রধান জিহান
কলেজ নম্বর: ৮৭২১
শ্রেণি: নবম, শাখা: ঙ (দিবা)

জাহিদ ও জিহান

রাত ১২টা। রাত হওয়ার কারণে তো ঠাণ্ডা আছেই, তারপরে আবার মেঘলা আকাশ। রাতের বেলা আড্ডা অনেকেই দেয়, আমরাও কোনো ব্যতিক্রম নই। গ্রীষ্মকাল, তাই সকালে ভালোই রোদ ছিল। তবে এখন বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। আমি আর জাহিদ নিচে হাঁটছি আর গল্প করছি। আজকের গল্পের টপিক, "আমরা যে পৃথিবীতে এসেছি, কী করতে এসেছি?" টপিকটা আসলেও অদ্ভুত। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখি এক লোক আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে হাঁটছে। লোকটার গায়ে শীতের কাপড়! কাপড়গুলো ভালোই মোটা। যাই হোক, গ্রীষ্মের সময় এরকম কাপড় পরার মানে হয় না, যতই ঠাণ্ডা হোক রাতে।

লোকটি চলে যাওয়ার পর জাহিদ বললো, "লোকটার ভাবসাব মোটেও ঠিক দেখছি না।" আমি মানুষের দিকে এতো তাকাই না। একটুও না ভেবে বললাম, "ঠাণ্ডা তো ভালোই, শীতের কাপড় পরতেই পারে।" কথাটা বলার একটু পর মনে হলো, এ শীতে তাই বলে এই কাপড় পরা লাগে না। জাহিদ তখনের জন্য বলল, "আচ্ছা।"

একটু আগে যে টপিকের কথা বলা হচ্ছিল, সে টপিকের উপসংহার টেনে দিয়ে জাহিদ বিদায় নিলো। আজকে ভলোই রাত হয়ে গেছে, তাই অনেকটা দৌড় দিয়েই বাসার জন্য রওনা দিলাম। পরদিন সকালে কখন যে ঘুম থেকে উঠলাম মনে নেই। ঘুম থেকে উঠার পর যেই না মোবাইলটা ধরব, সে সময়ে দেখি জাহিদ কল দিয়েছে। ফোনটা হাতে ধরে বললাম, "হ্যালো?" জাহিদ বলল, "তোর বাসার নিচে আয়, কথা আছে।" মানে যখন তখন একজন আমাকে কল দিবে, তারপর আবার বলবে, নিচে আয়।" তাও কি জানি মনে করে ভাবলাম, যাই নিচে যাই। নিচে যাওয়ার পর দেখি জাহিদ নাই। ওমা! কল দিলো বুঝলাম। নিচে আসতে বললো, তাও আসলাম। এখন সে আর নেই? ধুর! একটু রেগে বাসার জন্য পা বাড়াতেই জাহিদ পেছন থেকে পিঠে টোকা দিয়ে বলল, "কই যাস?" একটু দাঁড়ায় থাকা যায় না? ধৈর্য নেই?"

আসলেও ধৈর্য জিনিসটা একেবারে চলে গেছে আমার। এক তো এক কাজের প্রেসার, তারপর আবার ওভার থিঙ্কিং। সব মিলে আমার ধৈর্যের লেভেল এখন শূন্যের কাছাকাছি। এই ধৈর্য নিয়ে ওভার - থিঙ্কিং যখনি শুরু করব, তখনি জাহিদ বলল, "তো শুন! কালকে রাতে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম না?" আমি বললাম, "হুম, তো?" "ওই সময়ে তোর এলাকার তিনটি বাড়িতে চুরি হইসে একসাথে।"

এই কথা শোনার পর আমার মাথা গরম হয়ে গেলো। এইটা বলার জন্য উনি আমাকে নিচে নামতে বলেছেন। বাহ! কোনোরকম রাগ সামলে বললাম-

"তো এখন কি করব?"

"গোয়েন্দাগিরি।"

ধৈর্য না থাকলেও এইবার কথাটা শুনে একটু ভালোই লাগল। জানি ধৈর্য ছাড়া এইটা করা মোটেও সম্ভব না। তবে কাজটা ভারি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ দেখি কে জানি জাহিদের কাছেই আসছে। লোকটা কাছে আসতেই বুঝলাম, এ তো সাফকাত। আমাদের আরেক বন্ধু। তবে তার সাথে পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। সেও বুঝি আমাদের সাথে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। যা ভাবলাম তা-ই, জাহিদ তাকে আগেই বলছে যে সে গোয়েন্দাগিরি করবে। জাহিদ যে আরেকজনকে কেন ডাকলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাই হোক আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিলাম । জাহিদের কাছে আরো জানতে পারলাম এই চুরি চলছে গত এক সপ্তাহ ধরে। মানে গত সপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত চুরি হয়ে আসছে। ভালোই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যাপার। চুরি হচ্ছে আবার একই জায়গাতেই- মানে যেই এলাকায় আমি থাকি!

জাহিদ কিছুক্ষণ কী জানি চিন্তা করে বলল, "চল আমার সাথে।"

আমরা তাকে ফলো করা শুরু করে দিলাম। অবাক করে জাহিদ চলল আমার বিল্ডিংয়ের দিকেই! সাফকাত বলল, "ওইখানে কই যাস?" আমিও একই রকম প্রশ্ন করার পর জানতে পারলাম, আমার পাশের ফ্ল্যাটেই নাকি চুরিটা হয়েছে। আমার পাশের ফ্লাটেই থাকে সাজিদ। নতুন এসেছে সে, তাই ওর সাথে খুব একটা কথা হয়নি। জাহিদ সাজিদের বাসার কলিংবেল চাপতেই সাজিদ দরজা খুলে দিল।

"শুনলাম আপনার বাসায় না কি কালকে চুরি হয়েছে?"

ঘরে ঢুকেই কোনো আলাপ না করে জাহিদ প্রশ্নটা করাতে সাজিদ যেন একটু চমকে গেলো। আসলেও জাহিদের এইভাবে প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি। নিজেকে ঠিক করে সাজিদ বলল, "হুম! কিন্তু কেন?

"না মানে কিছু ইনফরমেশন লাগত।"

"যেমন?"

"চোরটা আপনি দেখেছেন?"

"না। কাউকে দেখিনি, তবে সকালে উঠে দেখি আমার দশ হাজার টাকা নেই! চুরি হওয়ার কথা জানতে পেরে সাথে সাথে পুলিশকে ঘটনাটা জানাই। আসলে এই বাসায় আর থাকা যাবে না। পরিবেশ যে ভালো না তা আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু চোর আসলো কীভাবে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"চুরি যেখানে হয়েছে ওই জায়গাটা একটু দেখানো যাবে?"

"অবশ্যই, আমার সাথে আসুন। তবে আপনি ঠিক কী জন্য দেখতে চাইছেন?"

জাহিদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সাজিদের সাথে চলে গেল। আমরা গেলাম। রুমে ঢুকেই জাহিদ আবার সাজিদের কাছে দেখে নিল যে কোন আলমারি থেকে টাকাগুলো চুরি হয়েছে। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েই জাহিদ আলমারি থেকে একটি কাগজ বের করল। আমরা সবাই দেখলাম সেখানে লেখা,"যন্তদ"। সেটা নিয়েই জাহিদ বলল, "ধন্যবাদ!"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে। এইটা নেওয়ার জন্যই কি এ বাড়িতে আসল সে? সে জানলো কীভাবে ওখানে একটা কাগজ আছে? আঁহ? চোর কি তাহলে এই পাগলটাই?

এমন সময় জাহিদ বলল, "এটা চোরই লিখেছে বটে!"

আমি বললাম, "তুই কীভাবে জানলি কাগজটা ওখানে ছিল?"

"ওমা! কাগজ সেইখানেই ছিল যেখানে টাকাগুলো ছিল। দেখতে পাবো না?"

আমি ড্রয়ারটাই খেয়াল করিনি তাই কাগজটাও দেখতে পাইনি। যাই হোক, আমি আর কথা বাড়ালাম না। জাহিদও সাজিদকে বিদায় করে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম।

বের হয়ে লিফটে যখন নামছি, তখন জাহিদ বলল, "যদি এক বাসায় চোরটা কাগজ রাখে, তাহলে সে আরেক বাসায় ফেলবেনা- তা হওয়ার কথা না। চল এখন আরেকটা বাসায় যাই যেখানে চুরিটা হয়েছে। তাইতো কনফার্ম হওয়া যাবে লেখাটা কার।"

এতক্ষণ সাফকাত চুপ করে ছিল। এবার সে মুখ খুলল, "আমার আসলে কিছু কাজ আছে। কালকে আবার আসবো। এর আগে কেস সলভ হলে তো ভালোই।"

কথাটা বলেই সাফকাত তার গন্তব্যের জন্য রওনা দিল। আমরাও চললাম নেক্সট বাড়িতে যেখানে চুরিটা হয়েছে। এর মাঝে আমার মাথায় যেন হাজারটা প্রশ্ন আসা শুরু করল। চোর কেনো ওভাবে আলমারিতে এরকম লেখা লিখবে? "যন্তদ" বলতে আসলেও কী বোঝানো হয়েছে। আর ওটা কি আসলেও চোরই লিখেছে না কি অন্য কেউ?

পরের বাড়িতে গিয়ে এতটুকু বুঝা গেল, কাগজটা চোরেরই। কী জন্য চোরটা এই কাগজ রেখে যায় আমি বুঝলাম না। পরের বাড়িতে যিনি থাকেন তার কাছ থেকে আমরা আরও জানলাম যে চুরি হওয়ার সময় তিনি নাকি চোরটাকে দেখেছেন চুরি করতে, তবে ঠিকমতো নয়। তিনি আরও বললেন যে চোরের কোনো ছবি যদি তাকে দেখানো হয় তাইলে তিনি হয়তোবা চিনতে পারবেন, তবে চোরের মুখ খুব ভালোভাবে মনে নেই তার।

বাসা থেকে বের হতে না হতেই জাহিদ বলল, "চোর যেহেতু প্রত্যেকদিন চুরি করছে, আজকে কড়া নজর রাখা যাক রাতের বেলা।" আমি তার কথায় একমত পোষণ করে বললাম, "ঠিক আছে। আজকে রাতে আসবো আবার। এখন তাইলে যাই।"

আজকে অনেক ক্লান্ত আমি। প্রথম বাসা থেকে যখনি বের হব তখনি জাহিদ বলল ও নাকি টুকটাক ঘুরাঘুরি করেই পরে বাসায় যাবে। সে যে ঘুরলাম আর তারপর পরের বাসায় গেলাম-বাপরে বাপ!

চোরের নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি আমার বাসায় ঢুকে জিরিয়ে বসতেই দেখি ডাইনিং টেবিলের উপর লেখা, "অনেক গোয়েন্দাগিরি হইসে আর লাগবে না। আপনাদের চোর বাবাজি খুব চালাক বুঝতেই পারছেন।"

আঁহ? চোর কীভাবে জানলো আমরা তাকে খুঁজছি? মাথায় প্রশ্ন ছিল অনেকগুলো তারপর আবার এই জিনিস ধুর! সঙ্গে সঙ্গে জাহিদকে ফোন দিতেই সে বলল, "আজকে রাতে আর আসিস না। চোর বাবাজি বেশিক্ষণ পালায় থাকতে পারে না।"

"কিন্তু আমার বাসার চাবি, সে কীভাবে পেলো?"

"অনেক চোর আছে যারা আরামসেই লক খুলে ফেলে। আজকে জানলি? যাই হোক, পরে কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম।"

"আহ! আচ্ছা! ওয়া আলাইকুমুস সালাম"

জানি এই রাতে আর ঘুমাতে পারবো না তাই ভাবলাম বই পড়ে টাইম পাস করা যাক। অনেক বই আছে আমার। যেকোন একটা বই নিয়ে পড়া শুরু করে দিলাম। গল্পের বই পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম আর কখন যে ভোর হয়ে গেল ঠিক জানা নেই। ফজরের নামাজ পড়ে বাসায় ফিরতেই দেখি সাফকাত ফোন দিয়েছে। ফোনটা ধরে বললাম, "হ্যালো?"

"ওই শুন! কালকে আমার ফোন বাসা থেকে উধাও হয়ে গেছে!"

"কেমনে কী?"

"সেড.....আচ্ছা কী করা যায়। আপাতত রাখ।"

বাসায় ফিরে আমার আবার মাথা ঘুরে গেলো। হাজারটা প্রশ্ন যখন মাথায় হঠাৎ জাহিদ আমাকে ফোন দিল। ভাইরে ভাই! আরাম করত একটু, কেবল ভোর থেকে সবাই কল দিয়েই যাচ্ছে। কল ধরার সাথে সাথেই জাহিদ বলল, "আজকে সকাল ৮ টায় সাফকাত এর বাসায় একটু দেখে আসব। বাই।" কথাটা বলেই কল কেটে দিলেন উনি। এমন ভাব যেন যাওয়াই লাগবে। আমি জানি এইসব কাজ ও একা করবে, আমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকবো, কিন্তু তাও যেহেতু সে আমাকে ডেকেছে তাই যাব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। সকাল ৮ টায় সাফকাতের বাসায় যাওয়ার সময় জাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, "যন্তদ" লেখাটি একটা চোর কেন

ফেলে যাবে? আর যদি এমন হয় যে এই লেখাটি আমরা ওই দুই বাসাতেই পেয়েছি? আর কোথাও নেই?"

"অনেক চোর মজা করে এরকম লেখা ফেলে যায়, মানুষকে আরও বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য। আর যে চোর তার "এইটা কী কোনো ক্লু হতে পারে?"

"হতেও পারে, নাও হতে পারে। এখন চুপ করে থাকো।"

ওর কথামতে চুপ করেই আমরা সাফকাতের বাসায় চললাম। সাফকাতের বাসায় যাওয়ার পর কলিংবেল চাপল জাহিদ। প্রায় দুই মিনিট পর সাফকাত দরজা খুলে বলল, "বাথরুমে ছিলাম তো একটু দেরি হয়ে গেছে।" জাহিদ বাসায় ঢুকে বলল, "ও আচ্ছা। যাই হোক তোর চুরিটা কই হইল?" সাফকাত সোজা তার রুমে গিয়ে দেখাল, "ঠিক এখান থেকে, সাইড টেবিলের পাশে ফোনটা রেখেছিলাম। এখন আর সেটি নেই!"

আমি মনে মনে ভাবলাম, এই ফোন নেওয়াটা খুব সহজ হবে না বলে যে কঠিন হবে তাও না। জানালার পাশেই যেহেতু ফোনটা রাখা ছিল আর সাফকাত যেহেতু নিচ তলায় থাকে, এটা সম্ভব।

এমন সময় হঠাৎ করে জাহিদ সাফকাতের পিছনে জোরে আঘাত করে হাত পা বেঁধে ফেলল! চোখের নিমিষেই! কিন্তু কেন? সাফকাত আবার কী করল? আমার যেন কেমন ভয় লাগা শুরু করল। মুখ থেকে আর কথা বেরুচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জাহিদ সাফকাতরে বলল, "তুই যে এরকম করবি জীবনেও ভাবিনি!"

"কী করছি আমি?"

"কিছু না করে থাকলে আমি তোকে এখনি ছেড়ে দিব। এখন বল, "আমরা কালকে প্রথম বাসাটা খোঁজ করার পর তুই কই গেছিলি?

"কই আর যাবো? আমি বাসায় চলে এসেছিলাম!"

"কেন ? আমাদের সাথে থাকলে তোর কী কী সমস্যা হতে পারত শুনি?"

"বোরিং লাগছিলো তোদের সাথে থাকতে, ডিটেকটিভ জিনিসে আগ্রহ নাই আমার তেমন।"

"তাই? পরের বাসায় খোঁজ করার পর জানলাম সে নাকি চোরের মুখটা অনেকটা দেখছে-মানে সে বলেছিলো চোরের মুখের ছবি দিলে সে নাকি চোরকে চিনতে পারবে। আমার বিশ্বাস তুই এই জন্যই তখন বাসায় চলে এসেছিলি যে কখন ধরা পড়ে যাস। তোর বোরিং লাগে নাই, লেগেছে ভয়।"

"যদি আসলেও বোরিং লেগে থাকে?"

"আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম, তুই এমনেই বাসায় চলেই আসতে পারস। কিন্তু তোর ছবি তাকে দেখানোর পর

"কিন্তু সে কি মিথ্যা বলতে পারে না?"

"প্রত্যেকটা বাসা যেইখানে চুরি করেছিস সেইসব বাসায় "টু-লেট" টাঙানো। তোর বাসায় "টু-লেট" কই? তোর এইখানেও তো একই চোর চুরি করছে, সেও তো একটা কাগজ রেখে গেছে! কিন্তু তোর বাসায় "টু-লেট" নাই। আমার বিশ্বাস তুই অন্যদের বাসা ভাড়া নেওয়ার নামে দেখতে গিয়ে চুরি করোছ"

সাফকাত যেন রেগেই বলল,"এইটার সাথে আমার সম্পর্ক কোথায়? আমিই আমার মোবাইল চুরি করব?" জাহিদ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "তোর বাসায় 'টু-লেট' কই?"

এবার আমার হাসি পেল। 'টু-লেট' এর উপর কেন নির্ভর করতে হবে? যা ভাবলাম তাই সাফকাত আমার মতোই প্রশ্ন করাতে জাহিদ এখন যেন চুপ করে আছে। প্রায় ২ মিনিট চুপ থাকার পর আমিই বললাম, "সাফকাত ঠিক বলেছে। তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটু রেস্ট নে।"

সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই সময়ে জাহিদ তার ব্যাগ থেকে একটা মোবাইল বের করে বলল,"এই নে তোর ফোন চোরটা আসলে আমি! এখন কি করবি?"

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। নিজেই গোয়েন্দা হয়ে নিজেই চোর! ভেবেছিলাম সাফকাত কিছু বলবে কিন্তু না, সেও চুপ! নীরবতা ভেঙ্গে জাহিদ বলল, "আমি কখনো বিশ্বাস করিনি যে তুই চোর হবি। তাই ভাবলাম তোর দেওয়া কাগজের লেখাটা কার হাতের লেখা। দেখলাম সেইটা তোর না। তারপর? তারপর এখন আমিই চোর! তোর ফোনটা চুরি করার পর দেখলাম তোদের চুরি করার প্লানিং। লেখাটা তোর বন্ধু 'অন্তু এর। মেসেজ চ্যাট করছোস বলে আরামসে তোকে ধরা গেসে। তোরা দুইজন "টু-লেট টাঙানো বাসা দেখতি, আর দেখার সময় একজন দেখতো, আর তুই চুরি করতি! অন্তু এখন অবশ্য জেলে চলে গেছে। তুইও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ!"

আজকেও রাত ১২টা। আজকেও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। আমি আর জাহিদ আজকে সেই একই জায়গায় হাঁটছি। এমন সময় জাহিদ বলল, "জিহান, বল তো ওইদিনকার ওই মোটা কাপড়ওলা লোকটি কে ছিল?।"

জাহিদ বলল, "আমাদের প্রিয় সাফকাত। ব্যাগে চুরি করা জিনিস নিলে মানুষ বুঝে ফেলতে পারে বলেই মোটা কাপড়ে সব ঢুকিয়ে রেখেছিল!"

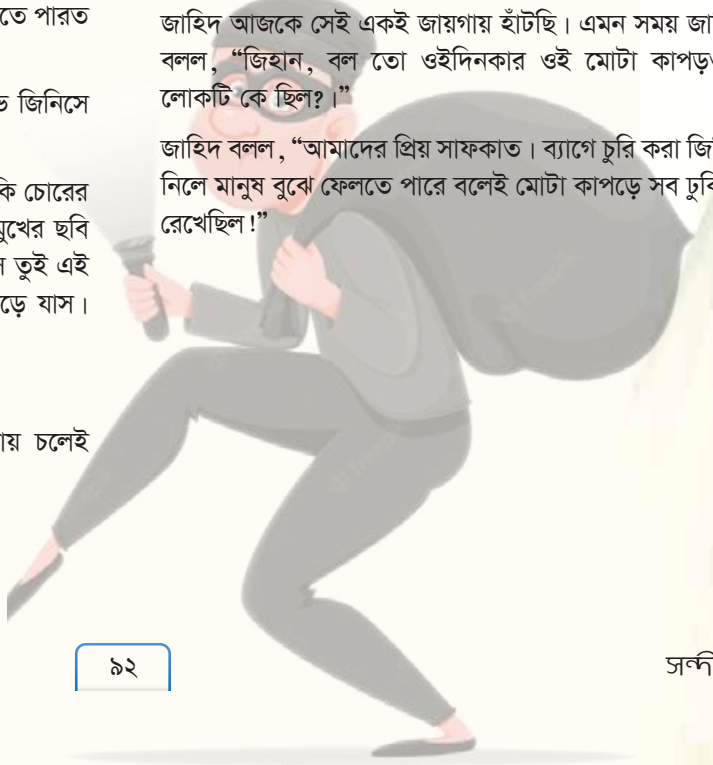

আবরার হোসাইন
কলেজ নম্বর: ১২৯০১
শ্রেণি: নবম, শাখা: খ (দিবা)

সময় রেখার পরিবর্তন

রাত ১১ টা । Lab এ বসে আছে Doctor Stallon John. চিন্তায় মগ্ন। Dr. John একজন বিজ্ঞানী। যদিও তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ। বলতে গেলে একজন পাগল বিজ্ঞানী। আর তার পাগল হওয়ার কারণ হলো তার ছোটবেলা। বাচ্চাকালে তাকে এতিমখানায় অনেক নির্যাতন করা হতো। যার ফলে তার মস্তিষ্কে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর বড় হতে হতে সে উগ্র স্বভাবের হয়ে উঠে। এখন সে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিতে চায়। সে চায় না পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকুক। মানুষের জন্য সে ছোটবেলায় আঘাত পেয়েছে তাই মানুষকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। আর সে তার এই পরিকল্পনাকে সফল করতে তৈরি করেন এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস যা অক্সিজেন, নাইট্রোজেনকে বিষাক্ত করে ফেলতে পারে। যার ফলাফলে পৃথিবীর পুরো বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হয়ে যাবে। আর এর ফলে মানুষসহ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী মারা যাবে তবে Dr. John এই গ্যাস এর বিস্ফোরণ বর্তমানে করতে চাচ্ছেন না। কারণ গ্যাসটি পৃথিবীর সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় নিবে আর ততদিনে মানুষ উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে গ্যাসটিকে নষ্ট করে ফেলবে। ফলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ। Dr. John চায় আজ থেকে ২০ হাজার বছর আগে গ্যাসটির বিস্ফোরণ ঘটাতে, কারণ তখন মানুষের সংখ্যা ছিল কম এবং মানুষ তখনও সভ্য হয়নি। আর অতীতে মানুষ মরে গেলে বর্তমানের মানুষের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন: কেউ অতীতে গিয়ে তোমার দাদাকে মেরে ফেললে তুমিও তোমার বাবা দুইজনেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অতীতের পরিবর্তন হলে বর্তমানেও পরিবর্তন হয়। তবে একাজটি করতে হলে তাকে অবশ্যই Time Machine আবিষ্কার করতে হবে, তবে Dr. John এর একটি সন্দেহ ছিল যে " Zone of Silence" জায়গাটিতে সময় স্বাভাবিক নয়। জায়গাটিতে একসময় স্বাভাবিক ছিল তবে ১৯৫৪ সালে জায়গাটিতে একটি বড় উল্কা পড়ার পর থেকে জায়গাটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। Dr. John জায়গাটিতে গবেষণা করার সময় একটি গুহা খুঁজে পায়। যা সে দেখতে পায় প্রথমবার। তবে সে সব থেকে বেশি অবাক হয় জায়গাটির ঠিকানা ইন্টারনেট এ আছে তবে এই গুহাটির ঠিকানা নেই। অর্থাৎ বাইরের মানুষের কাছে গুহাটি অস্তিত্বহীন। সারা পৃথিবীর মধ্যে সেই একমাত্র মানুষ যে এই গুহাটি সম্পর্কে জানে। আসলে তখন হাঁটাহাঁটির সময় Dr. John নিজের অজান্তেই একটি পোর্টালের মধ্যে প্রবেশ করে যা অদৃশ্য। আর এই পোর্টালের জন্যই গুহাটি অজানা সবার কাছে। পরে Dr. John এই পোর্টালটির রহস্য বুঝতে পারে। সে সেই গুহার মধ্যেই ২ দিন ধরে গবেষণা করে বুঝতে পারে গুহাটিতে সময় থেমে আছে। সাধারণত সময় বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে এগিয়ে চলে। তবে Dr. John বুঝতে পারে যেহেতু গুহায় সময় থেমে আছে সেহেতু গুহাটিতে সময়কে সামনে পিছনে নেওয়া সম্ভব। আর এর কারণ গুহাটিতে থাকা গামা এনার্জিটি এমন এক এনার্জি যা আলোর গতিকেও হার মানায়। আলো ১ সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কি:মি: যেতে পারে। তিনি আলোর গতি থেকে গামা এনার্জি দিয়ে Time Machine তৈরি করতে শুরু করে। এভাবে দীর্ঘ ১ বছর পর সে সফল হয়। তবে সমস্যা হলো মেশিনটি মাত্র ১০ বার ব্যবহার করা যাবে। এর থেকে বেশি ব্যবহার করলে গামা এনার্জির তাপে মেশিনটিতে বিস্ফোরণ ঘটবে Dr.John প্রথম ২ বার মেশিনটিতে ট্রায়াল দিয়ে এরপর তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করে। এরপর সে বর্তমানে ফিরে এসে সবকিছু গোপন রেখে আত্মহত্যা করে।

একমাস পর-

পৃথিবীতে অস্বাভাবিক হারে প্রাণী নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। গত একমাসে প্রায় ১০০ কোটি মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টিকে তদন্তের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় (EHSF) কে। যার পুরো অর্থ হচ্ছে Earth & Humen Safety Force. এই সংস্থা পৃথিবীর খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে অবদান রাখে (EHSF) এর প্রধান Stephden Arden, Mr. Arden. হলো Dr.John এর ছোটবেলার বন্ধু। সে একদিন Arden কে বলেছিল তার এই পরিকল্পনা, তবে তখনও John, Time Machine আবিষ্কার করেনি। এখন Mr Arden এসব শুনে তার হাসি পাচ্ছিল। সে ভাবে John তো পাগল, সে হয়তো এমনিই বলছে। তবে বর্তমানে মানবজাতির বিলুপ্ত হওয়ার জন্য সে Dr.John কেই সন্দেহ করছে। তাই সে সব বিষয়টি Agent Steve Bruce কে জানায়, Bruce মাত্র কিছুদিন আগে (EHSF) এর একজন এজেন্ট হয়। তখন Arden ও Bruce Dr. John এর Lab এ তদন্ত করে একটি ডায়েরি খুঁজে পায়। যেখানে John তার এই পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ধাপ লিখে রেখেছে, কারণ John স্মৃতি ধরে রাখতে পারত না। তবে ডায়েরিতে লেখা নেই গুহাটির অবস্থান। তাই এটাই তাদের বড় বাধা। তখন Bruce, Arden তার মেয়ে Flair কে তাদের দলে নেয় বিশ হাজার বছর অতীতে গিয়ে Gas টিকে বিস্ফোরণের আগে নষ্ট করে ফেলবে। তখন Bruce বলল আমাদের তো ৪ বার সুযোগ আছে তার কারণ Dr. John আগেই ৪ বার ব্যবহার করেছে। সে প্রথম ২ বার ট্রায়াল দিয়েছে এরপর অতীতে গিয়ে আবার বর্তমানে ফিরে এসেছে তাহলে ৪ বার হয়। আর এখন Flair Time Travel করে অতীতে গিয়ে ফিরে আসে তাহলে ২ বার সব মিলিয়ে ৬ বার। তাহলে

আমাদের আর ৪ বার সুযোগ আছে। তখন Mr. Arden থেকে যায় আর Bruce এবং Flair ২০,০০০ বছরে অতীতে যায়, তবে তারা ব্যর্থ হয়। কারণ ততক্ষণে গ্যাসটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ৭০% এ মিশে গিয়েছে। তারা তাদের সামনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে শুধু। আর কিছুক্ষণ থাকলে তারাও মারা যাবে। তারা দ্রুত বর্তমানে ফিরে আসে। এখন তাদের কাছে আর ২বার Time Machine ব্যবহার করার সুযোগ আছে। তারা আর কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। তখন Flair বলল কেমন হয় আমরা যদি অতীতে গিয়ে নিজেদের মানা করি ২০ হাজার বছর অতীতে না যেতে, তাহলে আমরা সময়ের পরিবর্তন করতে পারব ফলে আবার আমাদের কাছে ৪ বার সুযোগ থাকবে Time Machine ব্যবহার করার, তখন Bruce বলল তা করা যায় তবে এর ফলে আমরা আবার একই কাজ বার বার করবো কারণ সময় রেখার পরিবর্তন হলে আমাদের স্মৃতি মুছে যাবে। ফলে বার বার আমরা ২০,০০০ বছর অতীতে যেতে থাকব নিজেদের অজান্তে। তখন Adren বলল Flair যে কথাটি বলেছে তা করা যায়। কারণ আমি John এর ডায়েরিতে পড়েছি গুহাটিতে একটি আলাদা সময়রেখা আছে চল আমরা সেই সময়রেখার পরিবর্তন করি তাহলে সবার স্মৃতি মুছে গেলেও আমাদের মুছবে না। কারণ সেই সময়রেখায় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত মিলে একসাথে একটি আলাদা সময়রেখা তৈরি করে, তাই এটিকে বলে " Mixed Timeline" বা মিশ্র সময়রেখা।" তখন তারা "Mixed Timeline" এর সাহায্যে "Time Travel" করে। তাই এখন তাদের আবার ৪ টি সুযোগ হয়। তখন তারাও ৩ জন সিদ্ধান্ত নেয় আজ থেকে ৬ মাস আগে অতীতে গিয়ে Dr. John কে মেরে ফেলবে। কারণ তখনও John তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেনি। তবে Time Travel করে ৬ মাস অতীতে গিয়ে Dr. John এর কাছে গিয়ে দেখল Bruce আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এর মানে তার অস্তিত্ব কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর আগে Flair এর গায়ে লোহার একটি ভারি জিনিস পরলে Bruce Flair এর জীবন বাঁচাতে গিয়ে মারা যায়। তবে Bruce, Flair কে বলে আমি চালাকি করে ৬ মাস আগে এসেছি কারণ এটি আজ থেকে ১ বছর ৬ মাস আগের সময় তবে Mr. Arden আর তুমি ভেবেছিলে শুধু ৬ মাস। এখন তোমরা ২ জন, John যখনই Lab এ আসবে তাকে মেরে ফেলবে কারণ সে এখন (lethal G729) গ্যাস ও Time Machine কোনটি তৈরি করেনি। আর সে এখন মারা গেলে সম্পূর্ণ সময়রেখা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। পৃথিবী স্বাভাবিক হয়ে যাবে মানবসভ্যতা বেঁচে যাবে। সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে।

১ বছর পরের কাহিনী

সবকিছু এখন স্বাভাবিক। কেউ জানে না যে ১ বছর আগে যে মানবসভ্যতাসহ পুরো প্রাণীকুল ধ্বংসের মুখে ছিল। কারণ সময়রেখার পরিবর্তন হওয়ায় সবার স্মৃতি মুছে গিয়েছে। সব স্বাভাবিক।

একদিন Mr. Arden তার কাজ শেষে রেস্টুরেন্ট এ গিয়ে দেখতে পান সেখানে Bruce আর Flair। এর আগে সে ভাবতো তারা তখনই মারা গিয়েছিলেন। সে তাদের দেখে খুশি হয়। তাদের কিছু না বলেই চলে যায় হাসতে হাসতে। Arden আজ অনেক খুশি।

[Mr. Arden ভাবতো Time travel করার সময় Flair এর অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যায় Bruce এর মত। তবে সব ঠিক হয়ে যাওয়ায় Bruce আর Flair আবার ফিরে আসে। তবে তারা শুধু নিজেদের অল্প কিছু স্মৃতি মনে রেখেছে। আর Mixed Timeline এর প্রভাবে তারা Mr. Arden কে ভুলে যায়। তারা নিজেদের আর Time travel এর কিছু স্মৃতি মনে রাখতে পেরেছে।]

আবু ইউসুফ সৌরভ
কলেজ নম্বর: ১৫৪৩০
শ্রেণি: দশম, শাখা: গ (প্রভাতি)

শেষ পৃষ্ঠায় সূচিপত্র

এই পৃথিবী, এই সভ্যতা সবকিছুই অনেক বুড়ো হয়ে গেছে তাই-না? আমাদের জীবনের অল্প সময়ের নিরীখে বুড়ো হয়েছি আমিও। সময়ের সাথে সাথে কতো অঢেল পরিবর্তন নিজের চোখে দেখেছি, অবাক হই! সময় পরিবর্তনের সমানুপাতিক। তবে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে এই সমাজের বয়সই যা বেড়েছে, অথচ আমরা বুড়ো হয়ে গেলেও সে দিব্যি আঠারো বছরের টগবগে তরুণ যেন। এই জন্য-ই হয়তো আমার কাছে গল্প শুনে ছোট ছেলেগুলো মুখ হা করে বসে থাকে, বলে নাকি ওরা টাইম মেশিনে বসে আছে! আসলেই হয়তোবা তাই।

আমাদের সময়কার স্কুলের দানবীয় মাস্টার মশাইদের এখন অনেক খুঁজি, পাইনা। আজকাল তাই শিক্ষকদের মান্য করার বিষয়টি মেনে নিতে কষ্ট হয় হয়তো অনেকের। হুট করেই হারিয়ে গিয়েছে তাঁদের বেত, হাওয়া হয়ে গেছে শ্রদ্ধা আর কদমবুসি। "আমরা বাবা-ছেলে কিন্তু বন্ধুর মতো" এ বাক্যের ব্যবহার এখন বেশ বেড়েছে। এখানকার সন্তানেরা তাই বেশ ভাগ্যবান-ই বটে, ভাগ্যক্রমে কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে বাবার শাসন তারা কম-ই পায়। কিন্তু যদি সেই বন্ধুর প্রতি অন্যায় হয়, তবে তোমার কী করা উচিত খোকা? কিংবা যদি বলি, সেই গল্পের খলনায়ক তুমি!

তিরিশ বছর ধরে গোলাম রাব্বানী সাহেবের বাসার কেয়ারটেকারের পদে নিয়োজিত আছি। আমার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে এই বাড়িতে। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও জানি না কী দেখে তিনি আমায় স্নেহ করতেন। গর্ব করে বলতেন, "মশিউর, এই বাড়ি তোমারও, ইতস্তত বোধ করার কোনো সুযোগ নাই"। স্বচক্ষে দেখেছি, কীভাবে তাঁর বিচক্ষণতায় তিনি একে একে তাঁর ব্যবসা, সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর অঢেল সম্পত্তির ভিড়ে তাঁর অতি সাধারণ জীবনযাপন তাঁকে আমার আদর্শ মানার মূল কারণ হয়তো। যেদিন বাড়ির ছোট কর্তা জন্মালেন, সেদিন কী আনন্দ! খুশিতে সবাই আত্মহারা। ছোট কর্তার বেড়ে ওঠতে কোন কমতি তিনি রাখেন নি। কখনো কখনো সাহেব নিজে গাড়ি করে ছোট কর্তাকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনতেন, পাশাপাশি কাজের তদারকি করতেন। আমার এখনো মনে আছে ছোট কর্তার প্রথম জন্মদিনে বড়সাহেব একটি বৃদ্ধাশ্রম খুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন,"আমাদের বাড়ি"।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে আমাদের। যখন সাহেব জীবনের গোড়ার দিকে আসলেন, ছোট কর্তার তখন শুরু কেবল। পড়াশোনায় ছোটবাবুর কোন মন ছিলো না। সাহেব সবসময় বলতেন, "ভালোমত যদি না পড়বি তবে আমার ব্যবসা দেখবে টা কে? "আফসোস, ছোট কর্তা ব্যবসা দেখেননি, দেখেননি নিজের পিতাকেও ...

আঠারোর পর ছোট কর্তার ভেতর আমূল পরিবর্তন আসলো। বাসার খাবার তার মুখে রুচে না, সচরাচর তিনি বাসাতে থাকতেন না, ফিরেন গভীর রাত করে। রাব্বানী সাহেবের একমাত্র সন্তান হওয়ায়, এই বয়সে এসে তাঁর চিন্তার কোন শেষ ছিলো না।

তখন ছিলো শীতকাল। একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ের কামড় কখনো সইতে হয়নি আমাদের মেমসাহেবের। বড়সাহেবের এই সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পেছনে যে মানুষটি তাঁর ভরসার পাত্র ছিলেন। তাঁদের সংসারে সুখের কমতি হয়নি, কিন্তু সন্তানের আশা তাঁদের উভয়ের মনেই সবসময় জাগরূক ছিলো। মেমসাহেবের সন্তান-সম্ভবা হওয়ার পর বড়সাহেবই প্রফুল্ল ছিলেন, কোন যত্নের কমতি হওয়া চলবে না! এভাবে দশমাস পার হলো।

কিন্তু সেদিন অগ্রহায়ণের রাতে ছোট কর্তা পৃথিবীর মুখ দেখলেও, জীবনের মাঝপথে এসে আক্ষেপ করে স্রষ্টামুখী হতে হয় মেমসাহেব এর। জীবনের এই মুহূর্তে, অনেক বাধা পেরিয়ে, একজন স্বপ্নবাজ অসহায় পিতা তাঁর সদ্য জন্ম হওয়া সন্তানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, আর তারপর মুখ ফেরান নিজের প্রেয়সীর দিকে। কতো পরিকল্পনা থাকে এসময়ে তাইনা? যেন শুধু স্রষ্টাকে জিজ্ঞেস করার বাকি,"তুমি আমার সাথেই এমন কেন করলে খোদা?" গম্ভীর মুখে শুধু ভাবছিলেন হয়তো তাঁর দোষেই...।

মূল গল্পে ফেরা যাক, ডিসেম্বর এর বাইশ তারিখ সকাল নয়টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, "আমাদের বাড়ি" তে বড়সাহেব মারা যান। একটা ছোট্ট খামে চার লাইনের একটা চিঠি তিনি লিখেছিলেন বেশ আগে।

'এই "আমাদের বাড়ি" আমার খুব সাধের জায়গা। বন্ধু, তুমি জেনে রেখো তোমার প্রথম জন্মদিনে আমি এটা বানিয়েছিলাম। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, বয়স তো হয়েছে। তোমার প্রতি আমার কোন রাগ-অভিমান নেই, তোমাকে আমি চিরকাল ভালোবাসি'

এভাবে অনেক বসন্ত পার করেছি, অনেক হাড়কাঁপানো শীত এসেছে আমাদের উত্তরে। সেদিন ছোটবাবুর সাথে হলরুমে বসেছিলাম। তিনি বললেন তার স্বপ্ন আঁটকে আছে তার ছেলেকে নিয়ে। হাসি পেয়েছে, নিরেট হাসি! যে বাবা ক'দিন আগে ছেলের চিত্রশিল্পী হওয়ার শখ নিজের হাতে গুড়িয়ে দিয়ে মাথায় চাটি বসিয়ে হাতে বিজ্ঞান বই ধরিয়ে দিয়েছেন, তার মুখে এ

কথা মানায়নি। জানিনা, তার বোকা ছেলেটা কাল বাবার হুকুমে যে সার্টিফিকেট ঘরবন্দি করবে তা আদৌ তার জন্য কিনা!

আমি বিশ্বাস করি, এই অট্টালিকা-প্রতিষ্ঠান কিংবা কাড়ি কাড়ি টাকায় আমরা কখনোই সুখী ছিলাম না। সমাজের বিষাক্ত প্রতিযোগিতায় নিজেকে লেলিয়ে দিয়ে বরং দূষিত করেছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, নষ্ট করেছি সমাজের অবকাঠামো, মানদণ্ড কিংবা পরিবেশকে।

একদিন সভ্যসমাজ বলতে আর কোনকিছুই অবশিষ্ট থাকবে না যদি আপনি পরিবর্তন না হোন। সভ্য একান্তই যদি আপনি হন, সভ্যতা একান্তই আপনার হবে।

মোহের অন্ধকার বিলীন হবেই দেহ, মৃত্যু তো সইবে না বাহানা, ওপর থেকেই তারা সবকিছু দেখে নিবে, ওপারেই অন্তিম ঠিকানা।

তাহলিল আজাদ রোদুর
কলেজ নম্বর: ১৮৬০৫
শ্রেণি: দশম, শাখা: গ (প্রভাতি)

প্রকৃতির সাথে কিছুক্ষণ

ভোর বেলা থেকেই আকাশটা ধূসর মেঘে ঢাকা ছিল। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল-আবারও হবে হবে ভাব। যেমন ভাবলাম তেমনটাই হলো। হঠাৎ করেই শুরু হলো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। এই বৃষ্টি যেন প্রকৃতিকে বিশ্রামের সুযোগ করে দিচ্ছে। আজ এমনই এক দিনে বিচিত্র এক ধারণার সৃষ্টি হলো।

আজ সকালে বারান্দায় দেখলাম এক কিশোর মায়া ভরা চোখে তাকিয়ে আছে প্রকৃতির পানে। তার চোখ বলে দিচ্ছে, সে কি বোঝার বা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। আমি তাকে দেখছি আর অনুভব করছি। সে বারান্দায় চেয়ারে বসে পড়াশোনা করছিল। কিন্তু সে বুঝতেই পারেনি যে, প্রকৃতি তাকে অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলছে। বইটাকে রেলিংয়ে রেখে প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে সে অনেকটা সময় কাটালো। অথচ তার মনে বা চোখে নেই কোনো ক্লান্তি। বরং ক্ষণে ক্ষণে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সে, আর ধীরে ধীরে নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির সাথে। সে কি চিন্তা করছে কে তা জানে! এক পর্যায়ে মনে হলো, সে হয়তো তার ভাবনার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।

তখন সে বারান্দা থেকে সরে তার ঘরের দরজায় পাশের টেবিলে একটি ডায়েরি আর কলম নিয়ে বসে আবারও প্রকৃতিতে চোখ মেললো। তারপর সে ডায়েরিতে কিছু লেখা শুরু করলো। এবার আমিও তাকালাম বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতিতে। অনুভব করলাম এক অনাবিল প্রশান্তি। মনে হলো অসুন্দর বলে কিছুই নেই। সবকিছুতেই আছে সৌন্দর্যের ছোঁয়া। কলেজের ছাত্রাবাসের ডানদিকে কলেজের মসজিদের মাইকের ওপর প্রায় সময়ই কাক দাঁড়িয়ে থাকতো। তবে আজ ডানে তাকাতেই দেখলাম বৃষ্টি থেকে বাঁচতে কাকটি মাইকের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। সামনের তাল গাছের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো কাঠ-ঠোকরা পাখির বাসা বানানোর দৃশ্য। সামনের দিকে কলেজের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সেখানকার গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মাঠ আর রাস্তার কিছু অংশ। সেদিকে তাকাতেই দেখি ছাতা হাতে কিছু সময় পর পর অল্প ক'জন মানুষের হাঁটাচলা। এখানেও যেন লুকিয়ে আছে সৌন্দর্য। অর্থাৎ 'মানুষ যেহেতু প্রকৃতির অংশ, তাই মানুষও প্রকৃতির সৌন্দর্য।

হঠাৎ মাথায় এলো ছেলেটার কথা। সে এখনও লিখছে। জানতে ইচ্ছা হলো সে কি লিখছে! তার কাজ দেখতে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলাম। তারপর তার লেখা দেখতেই শিহরিত হয়ে গেলাম। দেখলাম আমার এতক্ষণের ভাবনার ধারণাগুলোই তার ডায়েরিতে কালো কালির কারাগারে বন্দি। তখন এক ধরনের অদ্ভুত-রোমাঞ্চকর বাস্তব বিষয় উপলব্ধি করলাম। বুঝতে পারলাম যে, দেহটা আমি নই দেহটা আমার- অন্যদিকে আমার আবেগ, বিবেক আর চিন্তাধারণাই একমাত্র আমি।

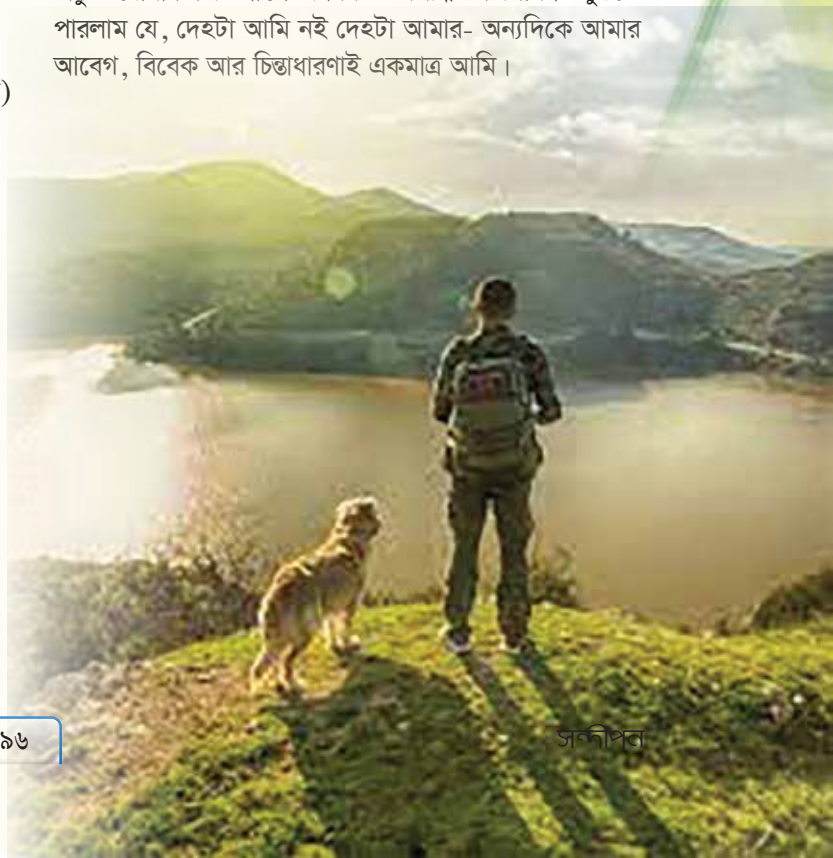

আল-আমিন আহমেদ
কলেজ নং: ১৭১৬০
শ্রেণি: দশম, শাখা: এ (প্রভাতি)

তরিকুল ইসলাম তরঙ্গ
কলেজ নম্বর: ১২৫৭১
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: জ (প্রভাতি)

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং

সাত শতকের চৈনিক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী। তার নামের ঠিক উচ্চারণ জুয়ানজাং এবং শাস্ত্রজ্ঞ অনুসারে হুয়ান-সাং হিসেবেও লেখা যায়। তেরো বছর বয়সে তিনি ধ্রুপদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহী হন। সে সময় তিনি লুওইয়াং নগরের বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সুই রাজবংশের পতনের পর তিনি জিংদুতে চলে যান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সন্ধানে চীন ভ্রমণ করেন। কিন্তু আশানুরূপ কিছু পান না। এজন্য গৌতম বুদ্ধের নিদর্শন এবং স্মৃতিধন্য স্থানসমূহ ভ্রমণের সংকল্প করেন। ৬২৯ খ্রি. চীন থেকে বাণিজ্য পথ ধরে মধ্য এশিয়ার কুচ হয়ে ভারতীয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের আতিথ্য লাভ করেন এবং ৩ সপ্তাহ ধর্ম আলোচনা করেন। তিনি ভারত ভ্রমণ করে অনেক বই নিয়ে আসেন; যদিও সিন্ধু নদে অনেক বই হারিয়ে যায়। ৬৪৫ খ্রি. তিনি চীনে আসেন। তাকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি বাংলার রক্তমৃত্তিকা (কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী) পুন্ড্রনগর, সমতট ও তাম্রলিপি সম্পর্কে তথ্য পুনরুদ্ধারে অসামান্য অবদান রাখেন। কোথাও কোথাও তার বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট হলেও সাত শতকের বাংলার ইতিহাস, বিশেষ করে শশাঙ্কের শাসনাধীন গৌড় রাজ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তিনি ৬৫৭টি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদ করেন। তিনি ভারত ভ্রমণের পর বৌদ্ধ শাস্ত্রের সঠিক শিক্ষা লাভে সক্ষম হন।

স্বাধীন হওয়ার গল্প

কিচির-মিচির, কিচির-মিচির... এমন শব্দ করতে করতে একসময় থেমে যায় পাখিগুলো। খাঁচার ভিতরের পাখিগুলো দেখে গর্বে বুক ফুলে ওঠে নাফিজের। ফুলবেই বা না কেনো! কত কষ্ট করে জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে হেঁটে খুঁজে খুঁজে এক জোড়া চড়ুই পাখি শিকার করতে পেরেছে। তারপর খাঁচার ভিতরে পুরে রাখার পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা পর শান্ত হয়েছে চড়ুই পাখিগুলো। নাফিজের খুশি দেখে কে? এতে নাফিজের মন খুশি হলেও চড়ুইদের খাঁচায় রাখার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি আছে ওর বাবার। তিনি চাননা কোনো মুক্ত স্বাধীন পাখি খাঁচায় থাকুক। কিন্তু নাফিজতো নাছোড়বান্দা। তাই "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" এই মহান বাক্য শুনিয়েও লাভ হলো না। তাই তিনি অন্য কোনো পথ খুঁজতে ব্যস্ত। এদিকে নাফিজ টিভি দেখে এসে ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে, "বাবা, আজকে নাকি স্বাধীনতা দিবস! স্বাধীনতা মানে কি? এটি কোন ধরনের জিনিস? ব্যস! নতুন বুদ্ধি উঁকি দেয় নাফিজের বাবার মাথায়। তিনি নাফিজকে বুঝান যে, স্বাধীনতা মানে হলো সকল ধরনের অন্যায় অত্যাচার ও খারাপ মানুষের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া। তিনি আরও বললেন যে, ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

তারপর তিনি বলা শুরু করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি। দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে নাফিজ শুনতে থাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি। বিস্ময়ের ঘোর থেকে বের হয়ে তার বাবা আরও বলেন, "তুমি কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হবে? মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য তো প্রথমে দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশের মাটি, মানুষ, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু তুমিতো চড়ুই পাখিগুলোকে খাঁচায় আটকে রেখে মিলিটারিদের মতো আচরণ করছো। মুক্তিযোদ্ধা হবার জন্য তো আগে তাদেরকে মুক্ত করতে হবে"। তিনি আড়চোখে নাফিজের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নাফিজ কতক্ষণ কিছু একটা ভাবলো। তারপর চলে গেলো তার রুমে এবং মুক্ত করলো পাখিগুলোকে। তারপর বাবার কাছে এসে বলল "বাবা এখন বলো, আমাকে কী করতে হবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য?" "তুমিতো এখনই মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছো"। নাফিজ তার বাবার কথা কিছু বুঝলো না। শুধু তার বাবার মতো তাকিয়ে রইলো আকাশের ওই পাখিগুলোর দিকে।

মো: রেদওয়ান হোসেন,
কলেজ নম্বর: ১১৫১৬
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: চ (দিবা)

মায়ের ভালোবাসা

রবি ক্লাস টেন-এ পড়া একজন ছাত্র। ছাত্র হিসাবে সে ভালোই ছিল। তবে সবসময় নিজের মত থাকতে ভালোবাসত। কিন্তু তার মা তার জন্য ব্যাকুল। সে খুব বিরক্ত হতো যখন তার মা তার জন্য না খেয়ে বসে থাকত। যেমন রবি খেয়ে নাও, রাত হয়েছে এখন ঘুমাও, এই দুধটুকু খেয়ে নাও এই সব।

রবি তার মাকে সবসময় বলত মা আমি এখন বড় ক্লাসে পড়ি। আমার বুদ্ধি হয়েছে না? তুমি আর বিরক্ত করো না। মা তার সে কথায় না রেগে বলত- বোকা ছেলে! মা হলে বুঝতে কী জন্য এরকম করি। তবুও রবির এমনটা ভালো লাগত না। হঠাৎ একদিন মা অসুস্থতাকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি, কারণ সে ভেবেছিল তার মা অন্যবারের মতো এবারও ভালো হয়ে যাবে। অসুস্থ অবস্থায় তার মা তাকে একদিন ডেকে বলল-বাবা রবি, তুমি কিন্তু তোমার পড়াশোনা ভালোভাবে করবে, ঠিকমতো ঘুমাবে, সময়মত খাবে, বাবার উপর কখনো রাগ করবে না। মনে রেখ, জীবনে বড় হতে গেলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়, বুঝতে পেরেছো রবি। রবি অন্যদিনের মতো বিরক্ত না হয়ে বলল ঠিক আছে মা, কিন্তু তখনও সে বুঝতে পারেনি যে তার মায়ের জীবন প্রদীপ আস্তে আস্তে নিভে আসছিল। একদিন তার বাবা হঠাৎ করেই তাকে স্কুল থেকে আনতে গেল। সে বুঝতে পারলো না কেন তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রবি যখন বাড়ির দরজায় পা রাখল তখন কান্নার শব্দ শুনতে পেল। তখন তার আর বুঝতে বাকি নেই যে তার মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। রবি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো, তার দুঃখের সীমা রইলো না। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে সবাই তাকে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। এর কিছুদিন পরে যখন রবি স্কুল থেকে বাড়ি এসে দেখলো টেবিলে ভাত রাখা আছে কিন্তু খাওয়ার জন্য বলার কেউ নেই তখন সে না খেয়ে ঘুমাতে গেল। কিছুক্ষণ পর তার বাবা বাড়িতে এসে বললো রবি পড়তে যাওনি? এমন মুহূর্তে তার শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। মনে মনে ভাবল মা থাকলে তাকে জোর করে খাওয়াতো, দুধের গ্লাসটা দিয়ে বলতো এই সবটুকু দুধ খেয়ে উঠতে হবে। এখনো টেবিলে সব কিছু সাজানো আছে কিন্তু কই পরম মমতায় কেউ তো আর জোর করছে না। সমস্ত দিনটা এমন করেই গেল রবির। রাতের বেলা যখন সে খেতে বসেছিল তখন তার বাবাও খেতে বসেছিলেন। রবির বাবা রবিকে সবটুকু খেয়ে উঠতে বলে চলে গেলেন। রবি তখন তার সামনে থালা রেখে ভাবলো তার মা থাকলে বলত এই নাও, এটা খাও, এটা খেয়ে উঠতে হবে। ভাবতে ভাবতে দুচোখ দিয়ে অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে খাওয়া শেষ না করেই ঘুমাতে গেল। সবকিছু তার কাছে কেমন যেন লাগছিলো। মনে হচ্ছিল সে বড়ো একা। বিছানায় মাথা রেখে রবি ভাবল পৃথিবীর সবকিছু অন্য কোন কিছু দ্বারা পরিমাপ করা যায় কিন্তু মায়ের ভালোবাসা কখনও কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। ভাবতে ভাবতে শত সহস্র অশ্রুফোঁটা তার বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল। তার অশ্রুফোঁটা যেন বলতে লাগল, "মা, মাগো তুমি যদি ফিরে আসতে, তবে তোমার রবি আর কখনও বিরক্ত হত না, মা"।

মো: রেদওয়ান হোসেন,
কলেজ নম্বর: ১১৫১৬
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: চ (দিবা)

মায়ের ভালোবাসা

রবি ক্লাস টেন-এ পড়া একজন ছাত্র। ছাত্র হিসাবে সে ভালোই ছিল। তবে সবসময় নিজের মত থাকতে ভালোবাসত। কিন্তু তার মা তার জন্য ব্যাকুল। সে খুব বিরক্ত হতো যখন তার মা তার জন্য না খেয়ে বসে থাকত। যেমন রবি খেয়ে নাও, রাত হয়েছে এখন ঘুমাও, এই দুধটুকু খেয়ে নাও এই সব।

রবি তার মাকে সবসময় বলত মা আমি এখন বড় ক্লাসে পড়ি। আমার বুদ্ধি হয়েছে না? তুমি আর বিরক্ত করো না। মা তার সে কথায় না রেগে বলত- বোকা ছেলে! মা হলে বুঝতে কী জন্য এরকম করি। তবুও রবির এমনটা ভালো লাগত না। হঠাৎ একদিন মা অসুস্থতাকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি, কারণ সে ভেবেছিল তার মা অন্যবারের মতো এবারও ভালো হয়ে যাবে। অসুস্থ অবস্থায় তার মা তাকে একদিন ডেকে বলল-বাবা রবি, তুমি কিন্তু তোমার পড়াশোনা ভালোভাবে করবে, ঠিকমতো ঘুমাবে, সময়মত খাবে, বাবার উপর কখনো রাগ করবে না। মনে রেখ, জীবনে বড় হতে গেলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়, বুঝতে পেরেছো রবি। রবি অন্যদিনের মতো বিরক্ত না হয়ে বলল ঠিক আছে মা, কিন্তু তখনও সে বুঝতে পারেনি যে তার মায়ের জীবন প্রদীপ আস্তে আস্তে নিভে আসছিল। একদিন তার বাবা হঠাৎ করেই তাকে স্কুল থেকে আনতে গেল। সে বুঝতে পারলো না কেন তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রবি যখন বাড়ির দরজায় পা রাখল তখন কান্নার শব্দ শুনতে পেল। তখন তার আর বুঝতে বাকি নেই যে তার মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। রবি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো, তার দুঃখের সীমা রইলো না। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে সবাই তাকে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। এর কিছুদিন পরে যখন রবি স্কুল থেকে বাড়ি এসে দেখলো টেবিলে ভাত রাখা আছে কিন্তু খাওয়ার জন্য বলার কেউ নেই তখন সে না খেয়ে ঘুমাতে গেল। কিছুক্ষণ পর তার বাবা বাড়িতে এসে বললো রবি পড়তে যাওনি? এমন মুহূর্তে তার শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। মনে মনে ভাবল মা থাকলে তাকে জোর করে খাওয়াতো, দুধের গ্লাসটা দিয়ে বলতো এই সবটুকু দুধ খেয়ে উঠতে হবে। এখনো টেবিলে সব কিছু সাজানো আছে কিন্তু কই পরম মমতায় কেউ তো আর জোর করছে না। সমস্ত দিনটা এমন করেই গেল রবির। রাতের বেলা যখন সে খেতে বসেছিল তখন তার বাবাও খেতে বসেছিলেন। রবির বাবা রবিকে সবটুকু খেয়ে উঠতে বলে চলে গেলেন। রবি তখন তার সামনে থালা রেখে ভাবলো তার মা থাকলে বলত এই নাও, এটা খাও, এটা খেয়ে উঠতে হবে। ভাবতে ভাবতে দুচোখ দিয়ে অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে খাওয়া শেষ না করেই ঘুমাতে গেল। সবকিছু তার কাছে কেমন যেন লাগছিলো। মনে হচ্ছিল সে বড়ো একা। বিছানায় মাথা রেখে রবি ভাবল পৃথিবীর সবকিছু অন্য কোন কিছু দ্বারা পরিমাপ করা যায় কিন্তু মায়ের ভালোবাসা কখনও কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। ভাবতে ভাবতে শত সহস্র অশ্রুফোঁটা তার বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল। তার অশ্রুফোঁটা যেন বলতে লাগল, "মা, মাগো তুমি যদি ফিরে আসতে, তবে তোমার রবি আর কখনও বিরক্ত হত না, মা"।

মোঃ তাসিন রহমান
কলেজ নং: ১০৫২৩
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এফ (দিবা)

পার্শ্বচরিত্র

শার্লকের ওয়াটসন, ফেলুদার তোপসে, ব্যোমকেশের অজিত এর মতো পার্শ্বচরিত্রগুলো পাঠকহৃদয়ে বহুকাল ধরে অনুরণন সৃষ্টি করে চলেছে। ফেলুদা, ব্যোমকেশ, শার্লক এ সকল চরিত্র নিয়ে আমরা অনেক সময় মেতে থাকি। এঁদের পার্শ্বচরিত্রগুলো নিয়েই আজকে আমার আলোচনা।

গল্পে আরও অনেক পার্শ্বচরিত্র থাকলেও তথাকথিত প্রধান চরিত্র নিয়েই আমাদের মাতামাতি। কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি, তাদের জীবনে এই মানুষগুলো না থাকলে আমরা তাদের গল্পগুলো জানতেই পারতাম না। আমার কাছে প্রতিটা গল্পের এই চরিত্রগুলো সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে আমার অন্যতম মুখ্য চরিত্র বলে মনে হয়। কারণ বিশেষ চরিত্রগুলো যাই করুক না কেনো, এরা না থাকলে তাদের মর্মই বুঝতে পারতাম না।

গোয়েন্দা গল্পের মূল আকর্ষণই হল থ্রিলার বিষয়টিকে সুন্দর করে সাজিয়ে উপস্থাপনা করা। আর এ সকল পার্শ্বচরিত্রের মাধ্যমে এই কাজটি সুচারুভাবে করে থাকেন সুদক্ষ সাহিত্যিকরা। আমাদের চারিপাশে এমন কি আমাদের নিজেদের জীবনেও হয়তো এমন ওয়াটসন, তোপসে, অজিত, থাকতে পারে। আমরা কঠিন মুহূর্তে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে তৃপ্তি পাই। এ চরিত্রগুলো আমাদের জীবনের কঠিন কাজগুলো সমাধান করতে উৎসাহ প্রদান করে। তারা আমাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী। আমার মতে এরকম চরিত্র আমাদের প্রত্যেকের জীবনে থাকে বা থাকা উচিত। শুধু আমাদের ভালো-খারাপ দিকটাকে তুলে ধরার জন্য নয়; আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্যও প্রয়োজন।

আমরাও অনেকের জীবনের পার্শ্বচরিত্র হতে পারি। তাই তাদেরকে অবজ্ঞা করা আমাদের উচিত না। তারাই আপনার প্রকৃত বন্ধু। কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা সকল পার্শ্বচরিত্রের মানুষগুলোর প্রতি।

বই ভালো সঙ্গী। এর সঙ্গে কথা বলা যায়।
বই সব উপদেশই দেয় কিন্তু কোন কাজ করতেই বাধ্য করে না।
- হেনরি ওয়ার্ড বিশার

আব্দুল কাইয়ুম ভূইয়া
কলেজ নং: ১০৫৫৮
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি (দিবা)

DNA

DNA কি? DNA হচ্ছে Deoxyribo Nucleic Acid (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)। কিন্তু এই DNA থাকে কোথায়? থাকে আমাদের শরীরের কোষে। এই DNA এর কাজ কি? এককথায় নানা প্রকার জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বংশবিস্তার সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে DNA. কিন্তু একটি বিষয় হয়তোবা অনেকেই জানে না এই DNA এর ইতিহাস নিয়ে তা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা যখন DNA আবিষ্কার করে তখন তারা বলে শরীরের প্রায় ৯৬-৯৮% DNA হলো নন-কোডিং, অর্থাৎ এর প্রোটিনে কোনো প্রকার তথ্য সরবরাহ করে না। ২-৪% DNA ছাড়া বাকি সব DNA- নন কোডিং। এগুলোর নাম দেওয়া হলো তখন junk DNA আর junk মানেতো সকলের জানাই আছে। আর এই আবিষ্কারের পর বিবর্তনবাদীরা খুশিতে নেচে উঠলো। তারা বলতে লাগল যে এই junk DNA ডারউইনের মতবাদ প্রমাণের জন্য অনেক বড় একটি প্রমাণ। তারা বলল মিউটেশনের সময় এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে রুপান্তরিত হবার সময় এগুলো রয়ে গেছে আমাদের শরীরে। বিবর্তনবাদীদের গুরু জীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সতো এই নিয়ে একটি বই লিখে ফেলেন যার নাম হচ্ছে The Selfish Gene. বর্তমানে এই জেনেটিক্সের গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আমাদের শরীরের কোনো DNA-ই junk নয়। আমাদের শরীরে নানা বায়োকেমিক্যাল ফাংশন রয়েছে। আমাদের শরীরের কোনো DNA -ই ফালতু বা অকেজো নয়। যারা লাফাচ্ছিল DNA এর পূর্ববর্তী গবেষণা নিয়ে তাদের এবার চক্ষুচড়কগাছ। তারপরে তারা আর এই বিষয়ে নিয়ে কথা বলেনি। এই গেল DNA.

একসময় এপেনডিক্স নিয়ে সকলে মজা নিত যে এপেনডিক্স নাকি ফালতু জিনিস, এটা নাকি কোনো কাজের না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে এই এপেনডিক্স আমাদের সকল প্রকার ক্ষতিকারক পদার্থ হতে রক্ষা করে। এটি একপ্রকার সোনার মতো। এই গবেষণা প্রকাশ পাবার পর বিবর্তনবাদীদের মুখে আর কথা নেই।

তারপরে বিবর্তনবাদীরা আরও যেই কথা বলে সেটি হচ্ছে মানুষ নাকি এসেছে বানর থেকে। কিন্তু বহুকালের বিবর্তনতো আর এমনিতেই হয়ে যায়নি হয়েছে পালাক্রমে। কিন্তু এই যে এই ধাপগুলো যে ধাপ পার হয়ে বানর থেকে মানুষ হয়েছে বলে বিবর্তনবাদীরা প্রমাণ করতে চায় সেই ধাপগুলো এখনো পাওয়া যায় নি এগুলাকেই বলে Missing Link। কেউ কেউ বলে এক সময় ঠিক পেয়ে যাবে। তবে ২০০৯ সালে এরকম একটি Missing Link আবিষ্কারও হয়েছিল যেটি প্রমাণ করে যে, মানুষ এসেছে শিম্পাঞ্জির কোনো গোত্র থেকে, এটি নিয়ে ফলাও করে প্রচার করা হল। সকলের মনকে ভেঙ্গে এটি প্রমাণিত হয় যে Missing Link হচ্ছে Lamour নামক একটি প্রাণীর ফসিল। তখন সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তাহলে এখন কথা হচ্ছে যেই বিবর্তনবাদ মানুষের কাছে ১০০ বছর আগে সবচেয়ে মজাদার বিষয় লেগেছিল সেটি এখন অনেকে বলেছেন একটি মিথ্যা বানানো কথাবার্তা। এখন এই বিবর্তনবাদ কি? এটা হচ্ছে দুনিয়ার বুক থেকে ধর্মকে মুছে ফেলার শেষ সম্বল। যেটার চেষ্টা করছে সকলে ধর্মবিদ্বেষের কারণে। তারা তাদের মতবাদ জোর করে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে আর মানুষ এতে প্রতারিত হচ্ছে। তাই আমাদের সকলকেই এই সকল বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

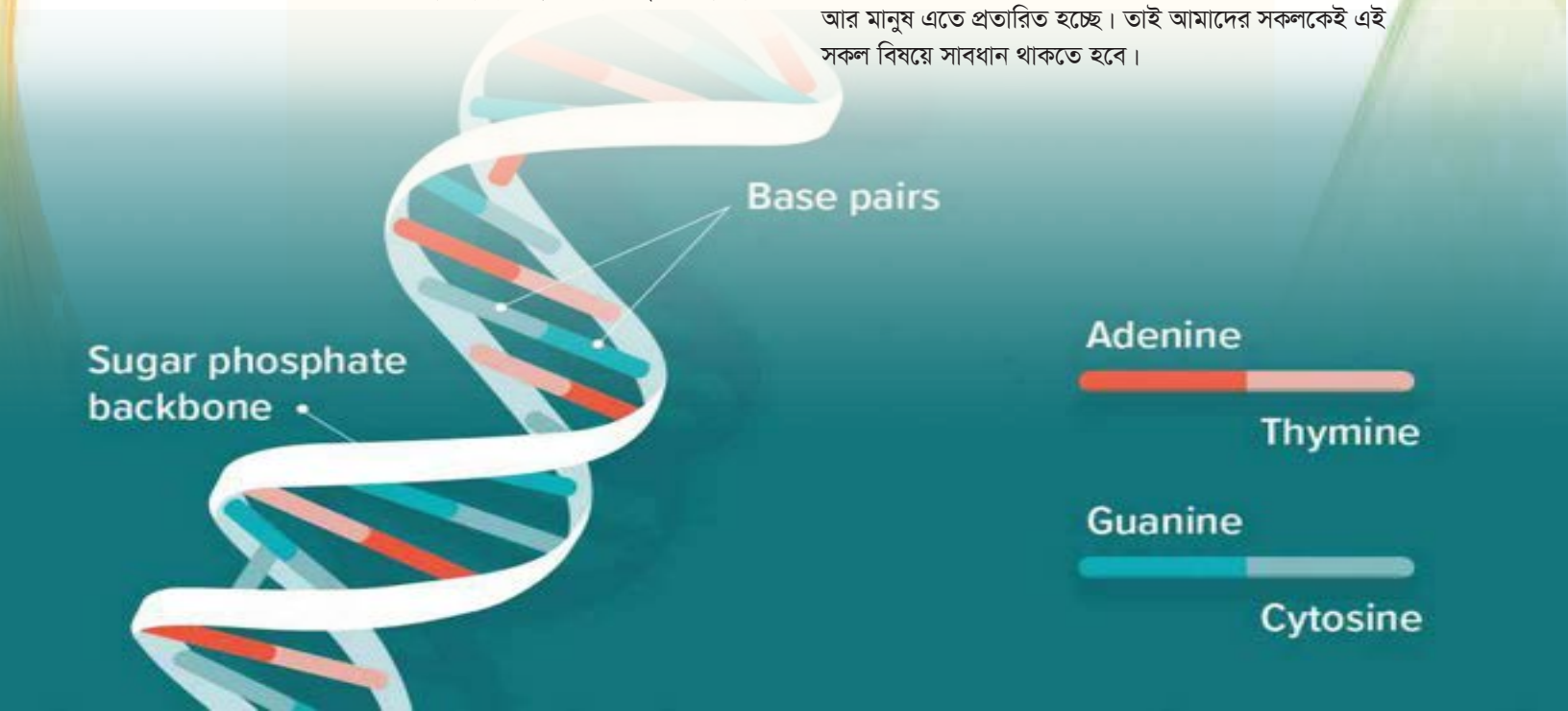

এইচ এম সামিন রেজা
কলেজ নম্বর: ১৮২৩০
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ছ (প্রভাতি)

পিপিই

ক্লান্ত শহরের এক নির্জন দুপুর। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশটা আজ কালো মেঘে ঢাকা। এমতাবস্থায় জানালার পাশে বসে বই পড়ছে অদিতি। উদাস তার চোখের চাহনি। মেঘের দেশে কী যেনো খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার চোখ দুটি। অন্যমনস্ক হয়ে কেবল অপলক দৃষ্টিতেই তার কী যেন আবিষ্কার করার কি চেষ্টা।

অদিতির বাবা নেই। ওর জন্মের দুই বছরের মাথায় বাবার মৃত্যু হয় এক সড়ক দুর্ঘটনায়। বাবা মারা যাওয়া পর পুরো পরিবারের দায়িত্ব মায়ের কাঁধে এসে পড়ে। অদিতির মা ছিল গৃহিণী। তাই সংসার চালাতে, ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া করিয়ে মানুষ করতে সেলাইয়ের কাজ বেছে নেন তিনি। এ বয়সে তাকে চাকরি দেওয়ারও তো কেউ নেই। ধীরে ধীরে উপার্জন বাড়তে থাকে তার। এভাবে একসময় অদিতির পরিবারে হাসিমুখ ফিরে আসে। অদিতির মায়ের বদ্ধ সংকল্প ছিল তার বড় ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবে। তবে আজকালকার দিনে ডাক্তারি পড়ানো এতই সোজা! মগজ খরচার পাশাপাশি প্রয়োজন টাকার খরচাও কিন্তু অদিতির মা দমে যাননি। তার বিয়ের গয়না বিক্রি করে ছেলের লেখাপড়া করান। কেউ কিছু বললে বলেন, "গয়না দিয়ে আর কী হবে? এত বছর তো পরলাম। ছেলে ডাক্তার হলে সংসারে আর অভাব থাকবে না। তখন এমন অনেক গয়নাই পরা যাবে। স্বপ্ন পূরণ হয় তার। প্রথম বারেই সঞ্জীব চান্স পায় মেডিকেলে।

কিন্তু এ হাসিমুখও বেশি দিন স্থায়ী হয় না। নতুন করে আরেক মেঘ দানা বাঁধে তাদের সংসারে। দেশে করোনা নামে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত। ব্যবসায়ী চিন্তিত তার ব্যবসা বন্ধ বলে, দরিদ্র মানুষ চিন্তিত দু'বেলা খাবার নিয়ে, সাধারণ মানুষ বিমর্ষ হয়ে আছে আক্রান্ত হওয়া ভয়ে, সরকার উদ্বিগ্ন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া নিয়ে। তবে অদিতির পরিবারে এ চিন্তার কারণ অন্য।

অদিতির বড় ভাই সঞ্জীব এবার ইন্টার্নি করছে। এ পরিস্থিতিতে ডাক্তারের সংকট থাকায় নিয়মিত মেডিকেলে যেতে হচ্ছে। তার উপর প্রথম দিকে পিপিই সংকট থাকায় হাসপাতালে পিপিই ছাড়াই কাজ করতে হয়েছে। এখন অবশ্য তা নেই। তবুও মনের ভয়কে কি আর পিপিই দিয়ে ঠেকানো যায়? তাই সঞ্জীবকে নিয়ে দুশ্চিন্তা সবসময় লেগেই থাকে। আজ সঞ্জীব বাসায় এলো বেশ রাত করে। মেডিকেলে আজ দু'জন করোনায় মারা গেছেন। আক্রান্তদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। অবস্থা ভালো নয়। খাবার টেবিলে বসে অদিতিকে বললেন, "বোনটি তুই কোনোদিন ডাক্তার হইস না। "তবে এ কথায় অদিতি তেমন বিচলিত না হলেও যেন তীরের মতো বিঁধলো তার মায়ের কানে। শুধুমাত্র অদিতির মায়ের ইচ্ছাতেই সঞ্জীবের ডাক্তারি পড়া। অদিতির মা কিছু বললেন না। খাবার শেষে সকলেই চলে গেল যার যার রুমে। এমনি করে দিন দুই পার হলো। অদিতি এবার দশম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুল বন্ধ থাকায় বাসায় বসেই পড়া সেরে নিচ্ছে। তবে এ আবদ্ধ অবস্থায় সেও এখন হাঁপিয়ে উঠেছে। কতদিন ধরে বান্ধবীদের সাথে দেখা হয় না। বিকেলবেলা এখন আর মঞ্জু আসে না গল্প করতে, আইসক্রিম ও আসে না অনেকদিন ধরে। কী জানি কেমন আছে সে! হয়তো সেও বাসায় বন্দি। কিন্তু তার তো সংসার চলে আইসক্রিম বিক্রি করেই। তবে কী হবে তার! লক্ষী পিসিকেও দেখা যায় না এখন। তার তো দেখাশোনারও কেউ নেই। আগে তো ভিক্ষের চাল দিয়েই দুবেলা খাবার জুটত তার। এখন তো তাও নেই। এসব ভাবতে ভাবতে মন ভার হয়ে যায় অদিতির। চোখে পানি চলে আসলেও মায়ের বকুনি খেয়ে পড়ার দিকে মন দেয় আবার।

আজ অদিতির জন্মদিন। প্রতিবছর এ দিনে অনেক আয়োজন থাকলেও এবার তা নেই। বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা হলেও এবার ঘুরতে যাওয়া হলো না। হলো না কেকের প্রথম পিছটা নিয়ে দুষ্টুমি করা। হলো না কেক কাটাও। লকডাউনে কেকের দোকান বন্ধ যে। সাদামাটা হলেও জন্মদিনটা সব মানুষের কাছেই একটা অন্য অনুভূতির। অদিতি আজ তাই বাঁধ সাধলো সঞ্জীবের হাসপাতালে যাওয়ার পথে। সঞ্জীবকে কিছুতেই হাসপাতালে যেতে দেবে না সে। সঞ্জীব যে আজ বাসায় বসে তার সাথে লুডো খেলবে, গানের কলি খেলবে, গল্প করবে। আরও কতো আবদার তার। কিন্তু সঞ্জীবের হাসপাতালে যাওয়াও জরুরি। ওদিকে অদিতিও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সামনের মাসে অদিতিকে নতুন জামা আর চুড়ি কিনে দেওয়ার শর্তে যেতে দেওয়া হলো সঞ্জীবকে। সঞ্জীব আজ সন্ধ্যাবেলা-ই বাসায় ফিরে এসেছে। শরীরটা ওর ভালো ঠেকছে না। তাই আগেভাগেই চলে এলো। দু'দিন ধরে জ্বর জ্বর লাগছে। আজকে গলা ব্যথাও শুরু হয়েছে। লক্ষণ ভালো নয়। বাড়ি ফেরা আজ কথাও বলেনি কারো সাথে। রাতে খেতে ডাকলেও খেতে আসে না সঞ্জীব। হয়তো সে বুঝতে পারে কিছু। হয়তো তাই পরিবারের অন্যদের কথা ভেবে এড়িয়ে চলছে তাদের। কিন্তু সঞ্জীবের সাড়া শব্দ মেলে না। সন্তানের দুশ্চিন্তায় ঘুম আর হয় না মায়ের। তবে শেষ রাতে ঘুম ধরা দেয় তার কাছে। ধরা দেয় সঞ্জীবও। তবে সে এবার ডাক্তারি পোশাকে বন্দি করে। সে ধরা দেয় প্যাকেট মোড়ানো লাশ হয়ে। কারা যেন দুর থেকে সঞ্জীবকে নিয়ে আসছে প্যাকেট বন্দি করে। প্যাকেটের মুখ খুলে সঞ্জীবকে দেখার আগেই যে সে প্যাকেট চলে যায় অনেক দূরে। চলে যায় চোখের আড়ালে।

শেষবারের মতো সন্তানের মুখও দেখা হলো না তার। শুধু চোখের পানি ফেলছে উঠানে বসে আর বলছে, "তোমরা আমার সঞ্জীবকে নিয়ে যেও না।" ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। সে বুঝতে পারে সেটা স্বপ্ন ছিল। তখনই ব্যস্ত হয়ে ছেলের রুমে যায় সে। কিন্তু সঞ্জীব বেড়িয়ে গেছে হাসপাতালের উদ্দেশ্য। সঞ্জীবকে একবার ফোন দেওয়ার কথা ভাবলেও পরে নিজেকে শান্ত করে মা। "ওটা তো শুধুই একটা দুঃস্বপ্ন ছিলো। দুঃস্বপ্ন কখনো সত্যি হয় নাকি! এখন সঞ্জীবকে ফোন দিলে খামোখা চিন্তা করবে।" এসব বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। সঞ্জীব পায়েস খেতে খুব ভালোবাসে। ছেলের শরীরটা খারাপ। বাড়ি ফিরে পায়েস দেখলে খুবই খুশি হবে। তাই ছেলের জন্য পায়েস রাঁধতে বসে মা। ভাগ্যের কী করুণ পরিহাস! ঐদিন-ই করোনা ধরা পড়ে। সতর্কতার জন্য তাকে রাখা হয় আইসোলেশনে। পরিবারের সাথেও আর দেখা হয় না তার। হয়নি বাড়ি ফিরে মায়ের হাতের পায়েস খাওয়া। মায়ের কাছে খবর পৌঁছায়। খবর পৌঁছানো মাত্রই মায়ের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে। সেদিন থেকে আর রাতে ঘুমায়নি মা। খাবারও খায়নি দুদিন। শুধু বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন ছেলেকে সুস্থ করে তোলার জন্য। প্রার্থনা করছেন স্বপ্নটা মিথ্যে হওয়ার জন্য। ছেলের জন্য যে পায়েস রেঁধেছেন তিনি। পায়েস যে এখনো ফ্রিজে পড়ে আছে। সঞ্জীব কি বাড়ি ফিরে সে পায়েস খাবে না!

করোনার সাথে সাতদিন যুদ্ধের পর অষ্টম দিনে হেরে যায় সঞ্জীব। থেমে যায় তার ক্লান্ত শরীর। চলে যায় সঞ্জীব না ফেরার দেশে। মায়ের কাছে খবর পৌঁছানো মাত্রই তিনি জ্ঞান হারান। ছেলের মুখটা শেষবারের মতো তার আর দেখা হলো না তার। পায়েস ফ্রিজে আজও পড়ে আছে। কিন্তু সঞ্জীব আর বাসায় ফিরবে না। মায়ের হাতের পায়েস খেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে না। তবে কি সেই ভোরের স্বপ্নটিই সত্যি হলো। ছেলেকে একটি বার আটকাতেও পারলেন না মা। শেষবারের মতো কপালে চুমু খেয়ে বলতে পারলেন না, "তুই যে আমার সোনার টুকরো ছেলে।" হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ-ই ধর্মীয় রীতিতে সকল কাজ সম্পন্ন করলো। চিরনিদ্রায় শায়িত হলো সঞ্জীব। যে ছেলেকে কখনো আড়াল হতে দেয়নি মা সেই ছেলেই আজ প্যাকেট মুড়ি হয়ে চলে গেলো মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে।

মা সেদিন সন্তান হারানোর শোকে জ্ঞান হারায়। পরদিন জ্ঞান ফেরে তার। মায়ের বুকফাটা কান্না আর বিলাপ চলে আরও দুদিন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে সে। শত যন্ত্রণা বুকে চাপা থাকলেও সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মেয়েটাকে বড় করতে হবে। বুকে কষ্ট আর মনে মনোবল নিয়ে কিছুদিন কেটে যায়। আজ সঞ্জীবের শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের ইচ্ছে থাকলেও তা আর হয়ে উঠে না। লকডাউন থাকায় বাড়িতে পূজা দিয়ে সঞ্জীবের জন্য প্রার্থনা করা হলো। রাতে সঞ্জীবের ঘর গোছাতে গিয়ে তার ডায়রির ভেতর লুকোনো একটি চিঠি পায় অদিতি। চিঠিতে লেখা ছিল-

"মা, আমার শরীরটা আজ ভালো লাগছে না। জ্বরের সাথে আজ গলা ব্যথাও শুরু হয়েছে। হয়তো আমিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। চারিদিকে যে অবস্থা তাতে আমি অবাক হবো না। আমি ডাক্তার হলেও তো একজন মানুষ বটে। কালকে আমাকে পরীক্ষা করা হবে। তাতে যদি করোনা পজিটিভ হই তবে হয়তো তোমাদের সাথে বেশ কিছুদিন দেখা হবে না। হয়তো এক সময় সুস্থ হবে বাড়ি ফিরে আসবো নয়তো..... আমার যদি কিছু হয়ে যায় তবে তুমি ভেঙ্গে পড়ো না। আমাকে সরকার যে সম্মানী আর ইনস্যুরেন্সের টাকা দিবে তা দিয়ে অদিতির পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। তোমাকে এবার আর কষ্ট করতে হবে না। যদি কখনো তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও আর আমার জন্য প্রার্থনা কোরো।" চিঠিটি পেয়ে অদিতি যেন পাথর হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না কি করা উচিত। ভাইয়ের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়ার জন্য অভিমান! নাকি ভাইয়ের যন্ত্রণা অনুভব করে তার জন্য কাঁদা! অদিতির চোখটা মুহূর্তেই ভরে যায় অশ্রুবাষ্পে। কিন্তু এখন কাঁদতেও পারবে না সে। তাকে যে এখন মাকে সামলাতে হবে। ভাইয়ের জন্য গর্ব হয় তার। ভাই যে একজন যোদ্ধা যে লড়াই করে অন্যদের ভালো রাখার জন্য। শত আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও যে পিছপা না হয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। তার ভাই তো মারা যাননি। শহিদ হয়েছেন। শহিদ হয়েছেন দেশের জন্য। দেশের মানুষের জন্য। ওদিকে শ্রাদ্ধের অপূর্ণতা মায়ের মনে তৈরি করে সেদিনের মতো কালো মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টি নামলো আজ তার দু'চোখ জুড়ে। পেছন থেকে অদিতি এসে জড়িয়ে ধরলো মাকে। চোখ মুছে দিয়ে বলল, "মা, আমিও বড় হয়ে ডাক্তার হবো। এমন ঔষধ তৈরি করবো যাতে আর কোনো বোন এভাবে তার ভাইকে না হারায়।

রিফাত বিন আজাহার
কলেজ নং: ১২৬৪৬
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এফ (দিবা)

শিক্ষা সফর

অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। সময় যেন কাটে না, দিন যেন যায় না। এখনও তিন দিন বাকি! এর অর্থ আমাকে এখনও তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে! উহ.....

মজার সেই দিনটি ছিল ১৮ই জানুয়ারি, ২০১৭। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে পদার্পণ করেছি। অপেক্ষার প্রহর শেষে ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই আমাদের সামনে আগন্তুকের মতো উপস্থিত হয় সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত।

আমাদের যাওয়ার সময়টা কাটে যেন ঘুমের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এর ভিতরেই কেউ ব্যস্ত ছিল বমি করার কাজে, আবার কেউবা ব্যস্ত তাদেরকে পলিথিন, ওষুধ ও স্যালাইন সরবরাহের কাজে। এভাবে কিছু সময় ঘুম ও নিস্তব্ধতার মাধ্যমে পার করার পর হঠাৎ সবাই জেগে উঠে। তখনো অন্ধকার কাটেনি। নীরবতা ভেঙে শুরু হয় উল্লাস। বাসের ভিতরে কয়েকজন মজার মজার কৌতুক বলে আমাদেরকে হাসায়, কেউ গান গাইতে শুরু করে আবার অনেকে কানে হেড ফোন লাগিয়ে নিজেকে গান শোনার কাজে ব্যস্ত রাখে। এভাবেই কেটে যায় সেই রাত।

যথারীতি গাড়ি চলতে শুরু করে। কিছুসময় চলার পর আমরা পৌছে গেলাম কুষ্টিয়ার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুঁঠিবাড়িতে। তিনি এখানে তাঁর যৌবনকালের একটা উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়েছেন। বাস থেকে সবাই শৃঙ্খলার সাথে নামি। নেমেই দেখি একটা চমৎকার সকাল, কোলাহল মুক্ত মনোরম পরিবেশ, পাখিদের কলরব। ঠিক এমন সময় আমাদের কানে ভেসে আসছিলো মিষ্টি সুরে একটি মধুর গান। 'এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী.....' গানটি আর কারো নয় কবি গুরুর লেখা রবীন্দ্র সংগীত। সত্যিই কী অপরূপ! কী মধুর সুরে একের পর এক বেজে চলছে। আমরা যেন হারিয়ে গেলাম সেই অপরূপ গানে। কিন্তু হারালে তো চলবে না, তার বাড়িটাও ঘুরে দেখতে হবে। তাই আর দেরি না করে সবাই চলে গেলাম তার বাড়ির ফটকের সামনে। কিন্তু তখনও দরজাটি খোলা হয়নি। কিছু সময় অপেক্ষার পর দরজা খোলা হলো।

একজন শিক্ষক আমাদের জন্য টিকিট (প্রতিবন্ধী ফ্রি, স্কুল শিক্ষার্থী ৫টাকা অন্যান্য ২০ টাকা) সংগ্রহ করলেন। আমরা প্রধান ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম চারদিকে প্রাচীর ঘেরা দু'তলা বিশিষ্ট একটা সুন্দর বাড়ি। বাড়ির চারপাশে ফুলের সমারোহ। সমস্ত উদ্যানটি যেন ফুলের গালিচা দিয়ে মোড়ানো। এমন সময়ই কবি গুরুর লেখা ঐ গানটি শুনতে পেলাম 'এখন আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা.....' সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং গানের কথাগুলোর মতো কিছু সময়ের জন্য যেন নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলল অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে। সেখানে আরো আছে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি বড় বড় আম গাছ, একটি পুকুর। আমরা তার ঘরে প্রবেশ করতেই দেখি তার বিখ্যাত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের সোনার তরীটি, জানতে পারলাম তার জীবনের নানা অজানা ইতিহাস। ঘরগুলো সুন্দর করে সাজানো। সেখানে রাখা আছে হাত পালকি, আট বেয়ারার পালকি, ষোল বেয়ারার পালকি। দেখলাম তার ছেলেবেলার বিভিন্ন ছবি। তাঁর পরিবারের ছবি। সবকিছু দেখা শেষে যখন তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছি তখনই যেন হৃদয়ে উঠল কবিগুরুর সেই কষ্টের গানটি-

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না, বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে.....।' গানটি মনে উঠতেই চোখে পানি চলে আসলো। বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রাচীরের বাইরে দেখলাম আরো একটা বড় পুকুর, যেখানে অনেকে গোসল করছে। পাশেই একটা মাঠ। রয়েছে ঘোড়ায় চড়ার সু-ব্যবস্থা। আমরা অনেকে ঘোড়ায় চড়লাম। এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। অনেক মজাও পেলাম। মাঠের সাইটে রয়েছে সারিবদ্ধভাবে সাজানো অনেক দোকান। দোকানগুলো একতারাসহ ঐতিহ্যবাহী নানা প্রাচীন জিনিস সামগ্রী দ্বারা সাজানো। দুপুরের খাবার খাওয়ানোর সময় চলে আসল। সবাইকে প্যাকেট দিয়ে দেওয়া হলো। খাবার হিসেবে ছিল ভাত, ডাল, ও কয়েক পিচ মাংস। প্যাকেট নিয়ে খাওয়ার জন্য আমরা যে যার ইচ্ছা মতো স্থান বেছে নিলাম। কেউ বসল চায়ের দোকানের সিটে, কেউ আম বাগানে, কেউ পুকুরের পাকা সিঁড়িতে। কেউ বসল চায়ের দোকানের পাশে রাখা বেঞ্চে। উল্লেখ্য যে, আমরা খাবার অনেকে কষ্ট করে শেষ করলাম। অনেকে পুরোপুরি শেষ না করতে পেরে নষ্ট করল। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন দুই-একজনও ছিল যারা বিশাল দেহের অধিকারী। একটা নয় দুইটা প্যাকেট খেয়েও তাদের ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব হয়নি। এর ভিতরেই আমরা কয়েকজন ছাত্র গিয়ে দেখে আসলাম কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত সেই পদ্মার পাড়। যেখানে বসে তিনি লেখালেখি করতেন। আরো দেখলাম তার কাছারি বাড়ি, যেখানে খাজনা নেওয়া হতো। মানুষ যেখানে ঢুকতে ভয় পেতো, সেই বাড়িটা গরুর বিষ্ঠায় (গোবর) ভরা। এখান থেকেই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, মানুষের ক্ষমতা, দাম্ভিকতা দীর্ঘদিন থাকে না। দু'তলা বাড়িটির দেয়াল, খুঁটির ধ্বংসাবশেষ কিছু অংশ নিচে পড়ে আছে। সকল স্থান পরিদর্শন

করে আমরা যখন গাড়িতে উঠে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন কবিগুরু যেন আমার কানে কানে বলছিল 'যাচ্ছ পথিক! যাও গো চলে, আবার মোরে খুঁজবে; দিনে দিনে কাব্য পড়ে আমায় যখন বুঝবে।'

পথিমধ্যে আমাদের গাড়ি রাখা হলো। সেখানে নেমে দেখলাম রেললাইন। রেললাইনের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী Harding Bridge এর আংশিক অংশ। রেললাইনের উল্টো দিকে একটা গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে উঠলাম একজন বিখ্যাত লেখকের বাড়িতে। 'বিষাদ সিন্ধুর' লেখক মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর বাড়িতে গিয়ে কিছু ছবি দেখলাম, তাঁর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র এবং তাঁর জীবনের কিছু অজানা ঘটানাও জানতে পারলাম।

এরপর আমরা পুনরায় বাসে উঠে চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম লালন শাহ এর মাজারে। তাঁর বাড়ির ভিতর আমরা প্রবেশ করলাম। বাড়িটি গাছপালা আর লতা-পাতা দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একটা ঘরের ভিতর তাঁর কবর। তাঁর কবরের পাশেই তার পালিত মা এর কবর। লালন শাহের ভক্তরা বসে গান করছে।

'ধন্য ধন্য বলি তারে, বেধেঁছে এমনও ঘর শূন্যের উপর পোস্তা করে। ধন্য ধন্য বলি তারে'..... তাঁর মাজারের অধিকাংশ লোকের মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় জটলা চুল। এদেরকে দু-একশ টাকা দিলেই শোনা যায় 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, পাখি কেমনে আসে যায়.....।'

এরকম নানান গান। সেখান থেকে আমরা আসলাম মাঠে। যেখানে মেলা বসে। এখানে আছে লালন ফকিরের দুটি ভাস্কর্য। সেখানেও মাথায় জটলা চুল ও মুখে বড় দাঁড়ি বিশিষ্ট একদল ভক্ত গান করছিল। গানের কথাগুলোছিল এরকম-

'আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়- পাড়ে লয়ে যাও আমায়.....।'

সবশেষে আমরা গাড়িতে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে বাসের ভিতর অনেক নাচ, গান, আনন্দ, হৈ-চৈ হলো। কেউ রসালো কথা দ্বারা আমাদের হাসাচ্ছিল; কেউ কবিতা আবৃত্তি করলো। বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে একজন আমাদেরকে গরম করে তুলল-

'বল বীর

বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর!

বল বীর

আমি চিরদূর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ , আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস...!'

বিদ্রোহী কবিতার চরণগুলো এখনকার সমাজের প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে তরুণ শিক্ষার্থীরা যখন হতাশ হয়ে যাচ্ছিল তখন আর বসে না থেকে কবি কামরুল আলমের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের আশা জাগানোর জন্য শুনিয়ে দিলাম একটি অনুপ্রেরণা মূলক কবিতা-

সত্য পথে কেউ হাঁটেনি

তাই কি তুমি হাঁটবে না,

কেউ খাটেনি সঠিক ভাবে

তাই কী তুমি খাটবে না?

স্কুলে ফিরে বাস থেকে নেমে দেখি তখন বাজে রাত ৯ টা। এত আনন্দের মধ্যে ছিলাম যে বুঝতেই পারিনি সময়গুলো কিভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। মনে হয়েছে সূর্য বুঝি আজ অস্ত-ই যায়নি। দিনটি ভুলবার নয়।

সারা জীবন উঠানো থাকবে স্মৃতির পাতায়। শেষটা যেন হলো কবি আহমদ আখতারের ফেলে যাওয়া কথাগুলোর মতোন-

বলা হয়ে গেছে সব কটি কথা

নিশ্চুপ বাসা বাড়ি

প্রকৃতিতে নেই কোন সংবিৎ

পাখিরা নিয়েছে আড়ি।

কাকে বলি আমি ভালো নেই

এই কথাটা নিরর্থক

না বলা কথারা থেকে যায় মনে

বলবার কত শখ।

নিয়াজ মাহমুদ নিউটন
কলেজ নম্বর: ১২৪৯৫
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ক (প্রভাতি)

হাউস লাইফ

সর্বপ্রথমে শুরু করতে চাই জেলখানার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে। এই জেলখানায় আপনার জন্য সব কিছুই আছে। বিনোদনের জন্য কমনরুম, ঘরোয়া খেলাধুলার জন্য টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এবং দিনব্যাপী আনন্দ করার জন্য তো বন্ধুরা সব সময়ই প্রস্তুত। তাই এই মজাদার হাউস লাইফটাকে আমরা ভি.আই.পি জেলখানা (V.I.P. Prijon) বলে অভিহিত করি। এই ভি.আই.পি জেলখানায় আমাদের জীবনের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে এমন বস্তু বা বিষয় ছাড়া সকল কিছুই বিদ্যমান।

এই হাউজ লাইফে এসে আমার জীবনের সব থেকে বড় পরিবর্তন হয়েছে ভবিষ্যতে অনেক বড় হওয়ার চিন্তাভাবনার দিকটা। সত্যি কথা বলতে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের নজরুল হাউসে উঠার আগে আমার জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। এক কথায় কপালের উপর নির্ভশীল ছিলাম। কেউ জীবনের লক্ষ্য জিজ্ঞেস করলে একটা হাসি দিয়ে বলতাম সময় আসুক তখন দেখা যাবে। প্যাড়া নাই চিল ম্যান। কিন্তু হাউসে এসে যখন দেখলাম যে আমার চারপাশে সব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্টিস্ট, জজ-ব্যরিষ্টার, ব্যাংকার (মানে হওয়ার প্রবল ইচ্ছা)। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ার তীব্র ইচ্ছা তখন ঠিক করতে বাধ্য হলাম আমি। আমি বিশ্বাস করি ডিআরএমসি এর সকল ছাত্রই তাদের নিজস্ব লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ সকলেই একদিন সফল হবে।

নিয়মানুবর্তিতার কথা যদি বলি আমরা হাউসের শিক্ষার্থীরা এইদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর এবং প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানতে পারি এবং ঠিক সেইভাবে বাস্তবায়ন করি। পবিত্রতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, সময়মতো ঘুম থেকে ওঠা, খাবার খাওয়া, গোসল করা, পড়াশোনা এবং পরিমিত ঘুম এই বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়েই চক্রাকারে ঘোরে আমাদের জীবন। বিশেষ করে, পড়াশোনার দিক থেকে সবাই-ই অনেক কঠোর। কেউ পড়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে, কলেজ থেকে এসে, বিকালে, রাতে কিংবা কেউ গভীর রাতে দরজার সামনের বারান্দার লাইটের নিচে বসে।

একটা মজার ব্যাপারে হলো নাইট ক্লাস যদি আমাদের না থাকতো তাহলে কেউ ই তার নিজস্ব বিছানা, পড়ার টেবিল, লকার গুছিয়ে, পরিপাটি অবস্থায় রাখত না। নাইট ক্লাসে শিক্ষকদের ভালোবাসা, তাদের ভয়ে এবং প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের পরিদর্শন করার কারণে বাধ্য হয়ে সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হয়। যা আমাদের পরিপাটি ও সুন্দর হতে শেখায়।

হাউসে আসার আগে অর্থাৎ বাড়িতে বসে যখন পড়াশুনা করতাম তখন কোনো সময়ে দিনে ২ থেকে ৩ ঘন্টার বেশি পড়াশুনা করেনি। কিন্তু হাউসে এসে মিলিয়ে পড়তে বসতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পড়াশোনা করি। কিন্তু যাদের দেখে আমার পড়ার প্রতি আগ্রহটা বাড়লো আমি তাদের এখন পর্যন্ত ছুঁতেও পারিনি। কারণ তাদের দৈনিক পড়াশুনার সময়সীমা ১১ থেকে ১৪ ঘন্টা। হাউসের কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম এবং গভীর দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য সুন্দর সুষ্ঠুভাবে চলে আমাদের হাউস। এছাড়া সকলের উপর সকল সময় নজর রাখে প্রিফেক্টোরিয়াল 'বোর্ড। আমাদের জীবনে পরিবেশ অনেক বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। হাউসে এসে যখন শিক্ষার্থীরা দেখে সকলেই পড়াশোনা করে বা তার চারপাশে ভবিষ্যতের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অবস্থান করছে , তখন তার ভিতরেও নিজেকে উপস্থাপন করার ইচ্ছা জাগে। সবশেষে বলতে চাই যে, হাউসে সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে মিশে হাউসের সকল নিয়মকানুন মেনে হাউসের সকল শিক্ষার্থীরাই তাদের নিজেদের পরিবার মনে করে কাটিয়ে দেয় জীবনের কয়েকটি বছর। ডিআরএমসির হাউস লাইফ সকলের জন্য স্মরনীয় এবং আশীর্বাদ হয়ে থাকবে।

ENGLISH SECTION

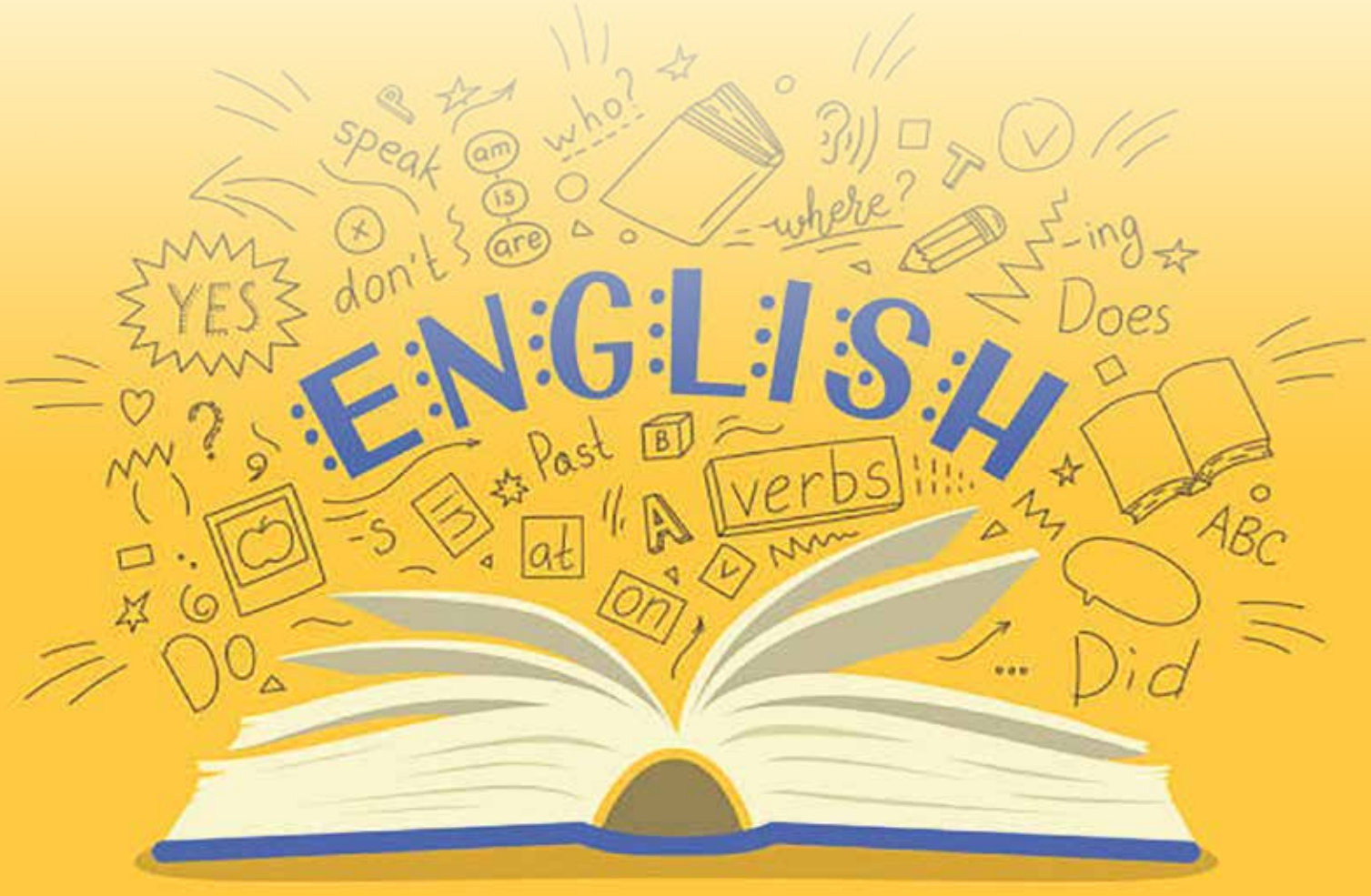

Mohammad Zarif
College No: 12731
Class: Three
Section : B (Day)

Be Happy

Hello friends, how are you all?
Be blooming and happy.
Don't be sad; life will fall.
Always try to be savvy.
Life is not a race;
Keep a smile on your face.

Md Tahrim Hossain Rizu
College No: 10402
Class: Six
Section: E (Day)

Mother

There is someone
Who loves you.
There is someone
Who cares for you.
There is someone
Who protects you.
There is someone
Who can do everything for you.
This is a Gift of God
It is none other
Than your own mother.

MD. Ahnaf Abedin
College No: 012727
Class: Three
Section : B (Day)

House

The mouse is in the alehouse.
The cat is at what to smouse
The dog is at what to bouse
All are there is a house.
The chocolate is like nectar.
The lion looks like a muser.
The people always loudly purr.
The house is here in nature.

Nahrur Rahma Adrito
College No: 12777
Class: Three
Section : B (Day)

MR. Moon

"Mr. Moon, Mr. Moon'
Come out soon!"
We are waiting
to see the full moon.

Mr. Sun is too hot.
So, we cannot go out.
We will be a little more relieved
If you come out soon.
Please, Mr. Moon,
Come out soon!

Fardin Rabbi Khan
College No: 17870
Class: Four
Section : E (Morning)

A Visit to Sajek Valley

The final exam was completed three days ago. The temperature was dropping. "Let's head to Sajek," my father said. I could not say anything because I was so ecstatic. On YouTube, I had seen a lot of Sajek videos. I was delighted at the prospect of going there right away. Wednesday, November 18th, 2020 was that day. We were all set to go. It was my first trip. So. I was thrilled. Our bus would leave Dhaka at 10 p.m. sharp. We got to the bus station a little early. My father had previously made reservations with St. Martin's Travels. We took our seats on the bus. It was a very nice air-conditioned bus. Our bus left at ten o'clock sharp. I sat in the same row as my father. The bus was moving at a breakneck pace. I am not sure when I fell asleep talking to my father. At 5:30 a.m., our bus arrived at Khagrachhari. We left in a Chandergari as soon as the sun came up, heading for Dighi Nala. My father informed me that we would be leaving Dighi Nala at 10 a.m., escorted by army guards, for Sajek. At 8 a.m., we finally arrived in Dighi Nala. Fortunately, one of my relatives' house was near Dighi Nate, so we were able to eat breakfast and relax. Dighi Nala was 44.4 kilometers away from Sajek. It took about 1 hour and 48 minutes to get there due to the uphill road. Anyway, we arrived at the front of the army camp just before 10 a.m. When I arrived, I noticed a long queue of lunar cars. In that queue, our car likewise came to a halt. At 10:15 a.m., the soldiers began advancing on the hill. Our car was rushing along the curvy, uneven route. I was enthralled; I simply looked about and was astounded. It was all green, all the time. I was struck by our country's beauty. The car was travelling up and down the hill at different intervals. The hills and springs encircled by trees had an unfathomable beauty. It was indeed a wonderful and memorable experience. On the side of the road, the natives' cottages were particularly lovely. Waving their hands, small children stood by the side of the road. From

afar, I was delighted to see Sajek's resorts perched on the crest of the hill. We arrived in Sajek shortly before 12 a.m. In the Sajek Valley, we had already reserved a lodging. The resort was lovely. We freshened up in the room before heading out to eat. At the well-known "Peda Ting Ting" restaurant, we enjoyed lunch with Sajak's famed "Bamboo Chicken." All of the eateries here served delicious meals. We went out to see Sajek when the lunch was finished. The view of the little hills below Sajek was breathtaking. Small resorts constructed of bamboo and wood were incredible. It was possible to have a close look at the clouds from this vantage point. As a result, the Sajek Valley is known as Rangamati's roof. We went for a walk and ended up in Lusai, a tribal village. I photographed Lusai's clothing and went out to observe their way of living. Konglak is Sajek's highest peak. It reaches a height of 1600 feet. We used a bamboo staff to ascend the Konglak hill from Ruilui Para. It was a pivotal event in my life. I was terrified of seeing the feared vision on the other side of the hill, which was why I was always gripping my father's hand. From the summit of Konglak hill, I could see the sun set. Everything seemed to be under my feet from the top of the hill. On the Konglak hill, we drank "Bamboo tea." We had banana and papaya for breakfast. We descended Konglak hill shortly before sunset. We spent a short time on the helipad before returning to the lodge. At 9:00 p.m., we had "Bamboo Biryani" for dinner. It was delicious. We returned to the lodgeroom after the supper and promptly fell asleep. We got up extremely early in the morning to catch a glimpse of the rising sun. As the sun began to turn crimson, it was a curiously lovely sight. All of the mountains were blanketed in cotton-like clouds. We appeared to be standing on top of the clouds. It was now time to bid Sajek farewell. We boarded the Chandergari after breakfast. Sajek seemed to fade away behind our eyes as the car began to move.

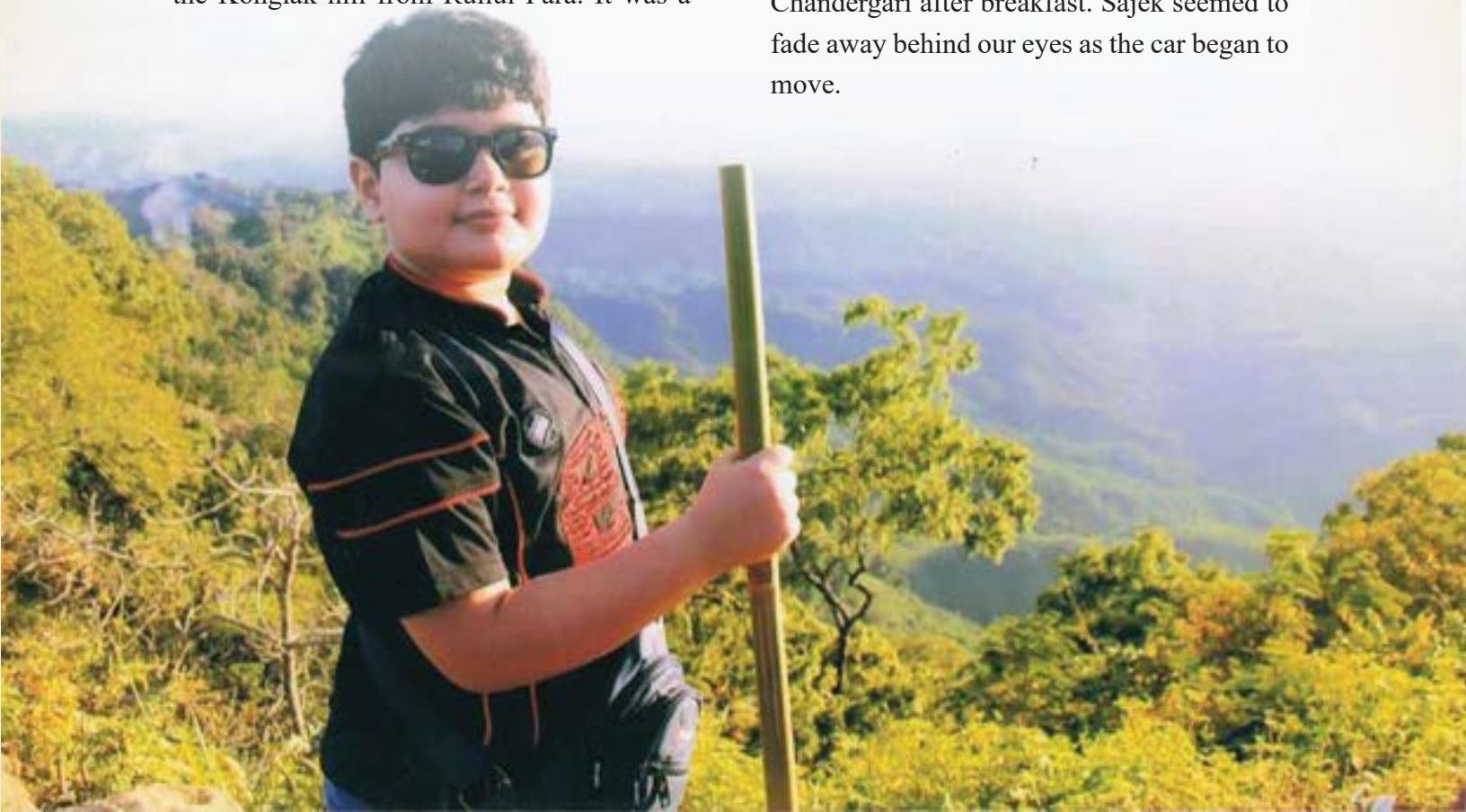

Md. Fahim Sahriar
College No: 11151
Class: Five
Section : E (Day)

A Terrible Night

Once upon a time, in London, there was an eight-year-old boy named Alex. He was a bright and courageous teenage boy. Alex went to the garden to play one day. He summoned his companions, but they did not show up. As a result, he was playing by himself. It was around 3 p.m. The garden was visited by a lovely puppy. Alex did not own the puppy, but he liked it. He was carrying a packet of biscuits. He tore it open and handed it to the puppy. He made the decision to take it home with him. Suddenly, the puppy began to run towards the woods. Alex began running after it. He chased it for a long time before collapsing from exhaustion. The puppy quickly vanished from view. Alex suddenly realised he had lost his way and needed to return home. He looked for the path for a long time but could not find it. The jungle was enormous. As he continued walking, night fell. He approached a large house with cobwebs and dust all over it. In one of the rooms, though, there was a burning candle. He decided to go inside. When he pushed the door open, all the lights turned on. He was struck by the sheer number of paintings on the wall. The paintings depicted landscapes and young women. When the door shut, he was staring at the paintings. He noticed a box near the front door. The room's door was quite old. The box, on the other hand, was brand new. In the box, there was a slip. Because there was no lock, Alex was able to open it. "Leave the house before 3 a.m." was scribbled on the slip. Alex was unconcerned about the warning. It was a two-story house with a basement. Alex was climbing the stairs when he heard a wolf howl. He was terrified. Then he discovered a weapon-filled chamber on the first floor. When Alex walked into the house, he heard the sound of an ankle sprain. He grew terrified and dashed to the door. The time was 3:50 a.m. When he turned around, his hair stood on end and icy blood rushed through his veins. A woman stood there, her clothes smeared with blood. Alex noticed a large window. He snatched the vase and used it to smash the window. He jumped through the window, and one of his legs was damaged by the shattered glasses. The leg was dripping with blood. His watch said it was 4.20 a.m. On his bicycle, a man was riding through the woods. Alex yelled for assistance, and the man stepped forward. The man collected Alex's parents' phone number and drove him home. Alex became really ill as a result of the incident. The house, on the other hand, has remained a mystery until now.

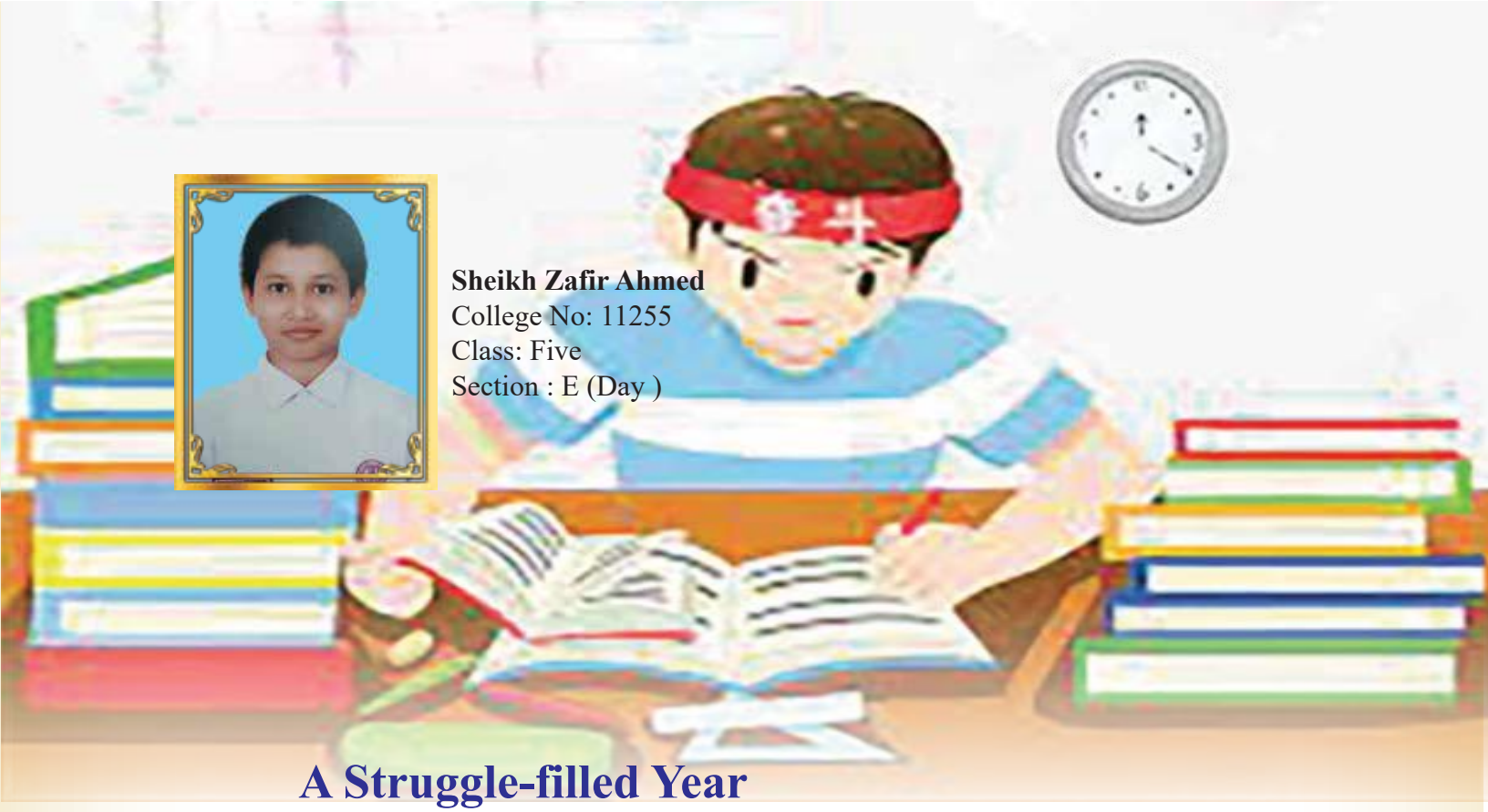

Sheikh Zafir Ahmed
College No: 11255
Class: Five
Section : E (Day)

A Struggle-filled Year

In my personal time, I frequently ruminate on the year 2018. It was the year I was preparing for the admissions test for the Dhaka Residential Model College (DRMC). It was a year of competition for me. In January 2018, my mother enrolled me in a coaching centre. Students were able to study for the DRMC admission test at that coaching centre. This stood near Asad Gate on Zakir Hossain Road. We were living around Mirpur 12 at the time. We came to the centre 4/5 days per week from Mirpur 12 throughout the year. My school started at 8:00 a.m. and ended at 1:00 p.m. As a result, I had to get up early the morning. I returned home after finishing school, ate lunch, and dressed. At 2:00 p.m., I went to the coaching centre with two of my friends and their mothers. We used to go to the centre in an auto rickshaw. Traffic congestion was common, and getting there took a long time. We were occasionally late. Coaching began at 3:00 p.m. and ended at 5:00 p.m. We boarded a bus to return home after the class. I was exhausted when I arrived home, but I still had to study. For a year, I had to study for both school and the admission test at the same time. In the centre, there were weekly model tests based on the lessons taught that week. My prior school was an English-medium institution, so I did not have to put up with anything. The coaching was conducted in Bengali, with a variety of lesson methods. As a result, I found it much more difficult to study and comprehend the lectures at the centre. Only four times did I get a score higher than 95. I did not want to study much at first, but my parents persuaded me that the admissions test was crucial. I, on the other hand, couldn't fathom the relevance. Fortunately, I did not give up and continued to be mentored. I gradually became accustomed to it, and it

was no longer as difficult for me as it had been at first. I knew that once I mastered the difficult task, doing the simple task would be a breeze. As a result, I excelled in my schoolwork. One thing, though, occurred unexpectedly. Typhoid struck in September. Perhaps it was the street food we ate as snacks from the food stalls that was the cause. For a week or so, I was ill with typhoid. For the time being, my parents put a stop to my coaching and school. I was really weak after that. I was not able to study as much as I had previously been able to. Slowly, I began to feel better. Nonetheless, it was quite difficult for me to continue. The admission test took place at the beginning of December. It was my first visit to the DRMC. I wanted to attend a school with a lot of open space, and this one met my requirements. The sight of the DRMC made me ecstatic. I took the morning and day shift admission tests. I had doubts about my capacity to pass the tests. When the results were announced, my name was not on the list. I was devastated. My father went over the published lists every day. My ID, on the other hand, was missing. As it was the winter vacation, we went to my Grandfather's house. My mother urged one of the instructors at the Centre to check the list posted at school as he was in Dhaka. One evening, he dialed my mother's number. My ID number was found on the waitlist, he told her. I was overjoyed when I learned the news. We immediately returned to Dhaka for the viva and to complete the admission process. I finally got myself admitted to Dhaka Residential Model College. I am so grateful to Allah that I was given a chance after a long year of struggling. Now I can run around with my friends in the DRMC fields and go to classes with a smile on my face. Now I understand why DRMC's motto, 'Strive for Excellence,' is so fitting. Without a question, 2018 was a challenging year for me.

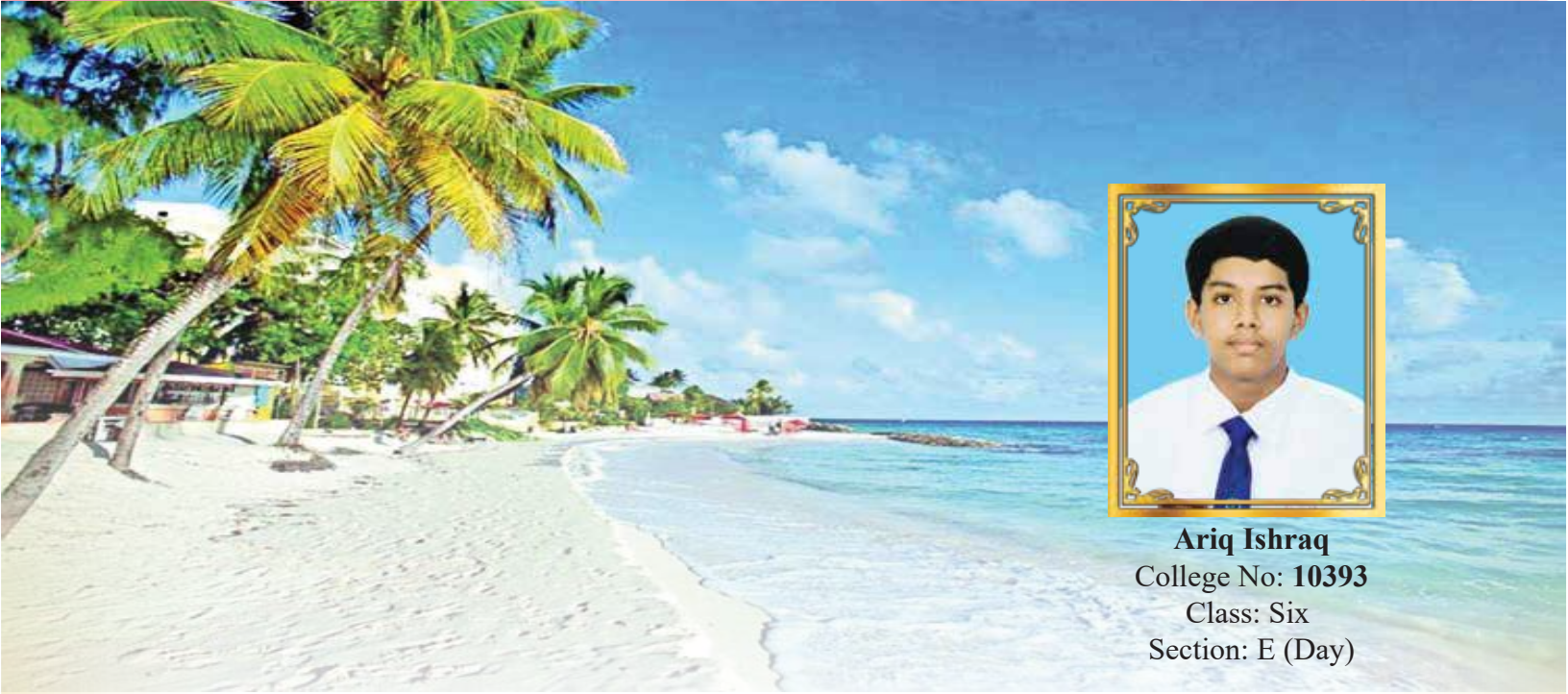

Ariq Ishraq
College No: **10393**
Class: Six
Section: E (Day)

A Trip to Cox's Bazar and Saint Martin

On January 1st, we visited Cox's Bazar. We arrived at Hazrat Shahjalal International Airport first. After that, we boarded the plane. We started off at 12 p.m. and arrived at Cox's Bazar at 2 p.m. We then proceeded to the hotel. We headed to the restaurant for lunch after taking a shower there. Then we headed to the sea beach in Cox's Bazar. The sea beach in Cox's Bazar is the world's longest. The sun was shining brightly. We took a lot of pictures and had a great time there. I watched television after returning to the hotel from the beach. We headed to the restaurant for dinner after a while. After that, we went back to the hotel and slept. We departed early the next morning for Saint Martin. By ship, we arrived on Saint Martin at 1 p.m. Saint Martin is Bangladesh's lone coral island. We noticed coral in a variety of shapes and colors there. On the shore, I also observed turtles. The water was crystal clear and bright blue. We had a BBQ party at night. We went to view Humayun Ahmed's residence the following morning after breakfast. There, we took a family photograph. After that, we returned to the hotel. We went to a restaurant for lunch after a while. We left for Cox's Bazar after lunch. We arrived in Cox's Bazar around 8 p.m. We then proceeded to our hotel. We went to a restaurant for dinner after a while. We slept when we returned to the hotel. We departed for Dhaka the following morning after breakfast. At 1 pm, we arrived in Dhaka. We then took an uber to our house.

Arshil Bin Wahid
College No: 13047
Class: Seven
Section: C (Day)

Three Pals' Adventure

Arshil, Hossain, and Tahmid were three pals. They were the ultimate adventurers. In their neighborhood, there was a book in a library that the forefathers referred to as a mysterious and cursed book. The three buddies, on the other hand, were scientifically inclined and did not believe it. They were supposed to instruct the public not to believe such ideas. At 2:55 a.m., they started walking to the library. The library was open at 3:30 a.m. when they arrived. They discovered the book in a book shelf corner, glowing brightly. They grabbed the book and began reading it from beginning to end. The book had an impact on each of them. They walked into the book and were immediately confronted with a blank white space. They discovered a person dressed in a red shirt flying on a red plane wielding a magic stick (everything inside the book was made of paper) and realised they had entered the book. The boy with the blue dinosaur said that he was the main character and that in order to get out of the book, they had to complete all of the tasks inside. However, anyone who had entered the book had yet to be able to exit it. Arshil was too sure of himself to be able to break free from the book. He also advised them to begin their adventure right away, and the book's secondary characters were Arshil, Hossain, and Tahmid. Then 'Sijan,' a supporting character, flew away. After a while, they saw that it was getting dark and that something was gleaming in the distance. They noticed it was an ancient people's village, and the inhabitants said they would die like the book's true side characters. The ruler of the village let them depart with the instructions to be intelligent, always choose the puzzle, and be helpful. Then they decided to abandon the village and discovered a forest on the location. They all planned to enter the jungle, but a security guard stopped them and handed them three infinity stones, which would make their journey much easier. The power of one stone was invisibility, the power of another was cutting anything faster, and the power of the last stone was manifestation. The security informed them that he was the guardian of the

genuine side characters, and that the stones could only be used inside the forest, and that only two people might pick. One stone was useful, while the other was useless. Suddenly, the security was gone. Because the forest was made of paper, Tahmid and Hossain chose the power of cutting and began chopping the forest. Arshil chose the stone of manifestation. The night passed, and Tahmid and Hossain spent the entire night cutting down the forest. After cutting through the forest all night, Hossain and Thamid arrived at a field and discovered Arshil dead. They realised Arshil was sleeping after a while, and their destination was a surprise to them. Arshil awoke and informed them that the manifestation stone had led him to their objective. And he slept the entire night away. Then they came to a house directly in front of them. When they entered the house, they discovered an elderly lady seated on a chair. "I am the grandmother of the main character of the book, and the main character was supposed to come to me every day," the old lady explained, "but he hasn't come to me in around 4 months. He left in his blue shirt on his blue dragon." "Doesn't he fly in a red plane and wear a red shirt?" Arshil was the one who responded. Arshil was told by the grandmother that he was the phony persona who had slain all the side characters. The grandmother then asked Arshil, Hossain, and Thamid to save his grandchild, blessing them and giving them three reviving stones. Arshil, Hossain, and Tahmid then exited the house. After a while, Tahmid awoke from his slumber, arousing Arshil and Hossain. They were trapped inside a hut with a boy bound to the hut's pillar. They also awoke the youngster, who they recognised as the protagonist. "Tuktuk" the dragon was killed by the phony persona. But they were all eager to get out of the hut. They discovered three doors: one was directed by fire, another by snakes, and the third was directed by a puzzle. Then Hossain instructed them to remember the former village ruler's sayings. And they all came to the conclusion that the last door, which was pointed by a puzzle, should be chosen. They were able to solve the first problem due to their intelligence, therefore they should now go to the second instruction, which was to select the puzzle. They exited via the door, safely escaping the hut with the main character Prantor. "Tuktuk" was discovered in front of the hut. Tuktuk had three heads, and the phony persona dismembered him into three pieces within each of his three heads. Then, after a while, the false figure approached them and informed them that death was approaching. They were all going to die shortly. The phony persona possessed strong imagination, and he could create an illusion with his mind in which everyone could see what he was thinking, but he could also conceal those ideas if he so desired. So, he came up with the idea of putting them in a cage, and they were caught in it. However, the genuine persona warned them that everything they would witness would be a hoax. So that they wouldn't be terrified of him, the phony persona said, "I can make fake things with my imagination, but my father can produce real things with his imagination, so be prepared." Because his father was a demon, the primary character Prantor was overpowered, but the fake one was even more so. They got into a struggle, but Prantor fell to the ground, making him weaker. The phony persona appeared to have sliced Prantor's head off, but Prantor did not die. Because Prantor

possessed immortality, and the phony character and his father were aware of this, the fake character and his father sacrificed actual people. Then they all chose to remember their previous directive, which was to be helpful. Arshil instructed everyone to use their reviving stones to resurrect Tuktuk's three heads. They all agreed and used their revive stones at the same time. Tuktuk then awoke and began roaring, destroying the fake persona and all of his illusions with his fire. As a result, they were able to get rid of the phony character. Arshil informed the protagonist that his grandmother was waiting for him. He, on the other hand, stated that he had no family. He was an angel who had been created from the ashes of the deity of joy. They knew Prator had no family, according to Prantor's information. What was the grandmother's name? They began their journey to their grandmother's house and arrived. They entered and discovered the house was deserted. It appeared that no one had lived there in a century. They were all taken aback, but Tuktuk assured them that he was not seeing anything resembling a house. Tuktuk explained that it was merely a cemetery. Prantor understood, so he began to perform certain rites. The entire house vanished in a matter of minutes, and everything was blown into a storm. Then they remembered what the phony persona had said. He said that his father's fictional ability could create genuine illusions. And they'll notice that it was none other than his father. They walked for a while and returned to the village where they had first arrived, where they discovered that every villager had been turned into a dog. Tuktuk was was able to comprehend what the animals were saying. When a dog alerted him that he was approaching, everyone perished from the annoyance. Arshil had no idea who the "He" was. Everyone was saying, "He's on his way." They were on the lookout for him. Prantor tried to persuade Arshil and his companions to leave, but they refused. They sought to save the book's characters and free them from the curse. Arshil, Tahmid, and Hossain, on the other hand, needed to eat because they were normal humans. As a result, they ate five fruits given to them by Prantor, and they could see the footprints of the phony character's father, who was the major villain. They arrived at a conclusion by following the footsteps. They tracked down the village's ruler, whom they had met previously. He informed them he wanted to be the leader of both the town and the book. So, he had to slay Prantor first, but then the phony persona appeared and uttered a Mantra before transforming into his true form. The main character Prantor was a phony character, and Prantor is the son of the main villain, therefore the phony persona was Prantor. Prantor, however, was not alone. He emerged with all of the Goddess of Goodness. And then everything came to a halt. The story came to a close here. And Arshil and his companions exited the book, leaving their mark on history.

Arib Mahmood
College No: 8610
Class: Eight
Section: E (Day)

A Wonderful Trip to Bandarban and Thanchi

Bandarban had always been on my travel wish list. It finally occurred in February 2020. My family and I decided to go to Bandarban. As a result, my father bought bus tickets to Bandarban. The bus was scheduled to depart at 11 p.m. The bus began its journey to Bandarban after we had boarded it, and thus my journey to Bandarban was under way. At 6:00 a.m., we arrived in Bandarban. We boarded another local car to Thanchi without waiting any longer. Thanchi's road was magnificent. Mountain and cliff scenes were spectacular. We came to a halt at a tea stall, where we sat and drank tea while admiring the breathtaking backdrop of mountains and cliffs. We arrived at Thanchi after 3–4 hours. After that, we returned to our hotel to rest for a while. We went to a local market in the afternoon after eating our lunch and purchased some lovely souvenirs. We left early the next morning for Remakri. The way to Remakri required a boat journey, and it was an excellent one. The road was well-known for its large stones and cliffs. I spotted a lot of large stones, some of which were 10-15 feet tall. From the boat, I also observed some stunning mountain scenery. They were incredible. It took us two hours to get to Remakri. We stopped in Remakri for lunch and to see some of the nearby villages. The rural people of those communities had a lifestyle that was very different from ours, as well as a diverse culture. We returned to Thanchi and resumed our journey to

Bandarban after spending some time in Remakri. We went straight to the hotel after arriving in Bandarban and rested for the night. The next day, we visited Bandarban's famous Golden Temple. The Buddha Dhatu Jadi was another name for it. The temple was stunning and immaculate. We visited the Meghla Parjatan Complex after surveying the temple. There was a lot of space in the park. There were a lot of mountains inside. I wanted to experience the amazing mountain scenery from the Ropeway because the park offered one. As a result, I acted quickly. The landscape was spectacular. The iconic Meghla Bridge was also visible. It was a suspended bridge because there was no support beneath it. The sight of the bridge hanging and people crossing it was amazing. We went to a famous area named 'Nilachal' after spending a couple of hours in Meghla Parjatan Complex. It was perched quite high above the typical ground level. I realised we were so far above the ground when we arrived at Nilachal that we could see clouds all around us. It was a once-in-a-lifetime experience. It was very amazing to watch the clouds coupled with the majestic mountains. In Nilachal, we returned to our hotel after observing the clouds and mountains. Then, on the same night, we packed our belongings and boarded a bus to return to Dhaka. I really encourage everyone to go to Bandarban because there are so many things to see and do there. I had a great time on this trip. This journey will stay with me for the rest of my life.

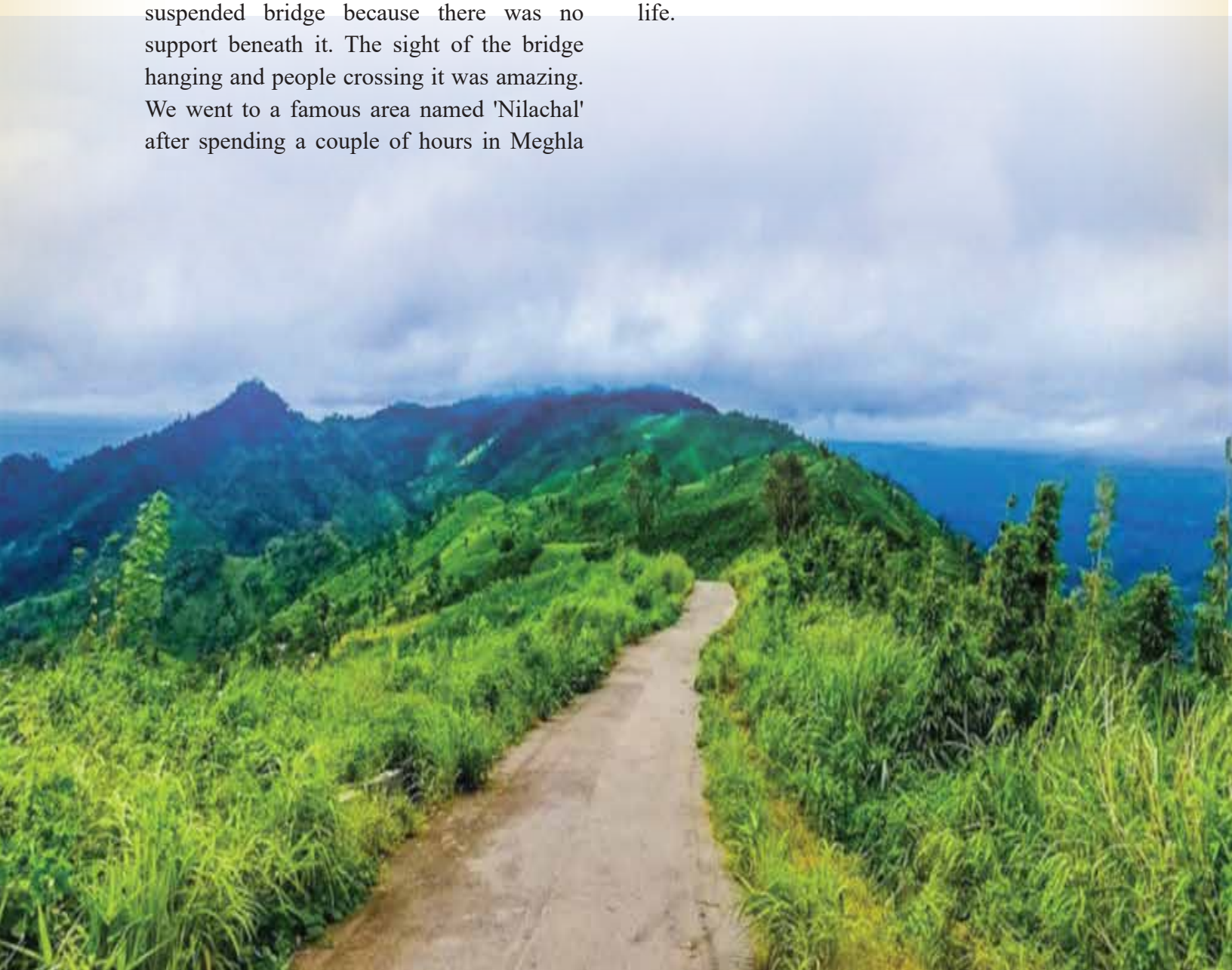

Shafin Nur Haidar
College No: 1530280
Class: Nine
Section: E (Morning)

A Mysterious House

Three pals, Karim, Rahim, and Fahim, reside in a little town near the Karnaphuli River. They read in eighth grade. They adore detective fiction and devour them. Their interest is to read different detective cases of fiction to solve problems of the residents of that town. In the town, they are known as detectives. They have already solved a lot of cases. Their school was once closed for a summer vacation. As a result, they decided to go for a picnic in the adjacent woods. The woodland was just as lovely as their village. The three pals went for a forest picnic. They left early in the morning with the intention of returning before sunset. They arrived at the picnic spot on time. Then Karim suggested that they take a walk in the forest and take in the view. The others were in agreement with him. However, they became disoriented while travelling through the jungle and were unable to return home. They looked all over the woodland but could not find anything. As darkness fell, the sky grew darker. Fahim then stated that we must make our way home, or else we must seek shelter in the jungle for the night. They started looking for a suitable refuge. Suddenly, they noticed a house on top of a hill. Then Rahim asked, "Does anyone live here?" From within, no one responded. "Anyway," he added, "this can be our refuge for the night." When they got close to the house, they noticed that it was an ancient house with no one living in it. Then Fahim revealed that his grandfather had told him of an old mansion hidden deep within this jungle. He told his friends that it used to be the home of a Zamindar during the British colonial period. He went on to say that the Zamindar died many years ago and left no heirs to his property, so no one lived in the house after he died. Without anybody to look after it, the house grew old and broken in several areas. Around the house, there were also numerous trees and plants. They came up to the front of the house. On all four sides, the home was enclosed by a large wall. However, they were fortunate in that they discovered a shattered wall and were able to enter through it. They arrived at the main entrance and attempted to enter it, but it was locked. As a result, they decided to look for another route in. Behind the house, they discover a shattered glass. They all entered the house one by one through the broken glass of the window after climbing up on a large rock. They were led into a room after entering the house. Nothing was in the hall room, which was completely vacant. Then they discovered the first-floor staircase. They began their journey to the first floor with the intention of exploring the house. "Do you hear that sound?" Karim asked his friends unexpectedly. Rahim expressed himself as follows: "No, that is not the case. Why wasn't I able to hear anything?" "I can't hear anything either," Fahim remarked. "No, I thought I heard something like a running machine, let's go," Karim explained. They observed three rooms over there as they got to the first floor. They made their way into each

one. In each of the three rooms, there was an ancient bed, two almirahs, and little tables and chairs. There was nothing but old clothes, empty drawers, and boxes in the almirahs. Fahim discovered some boxes in the drawer with pink-colored papers. They were shown to his pals. Karim stated that he has seen similar types of paper before, but couldn't recall where or when. Then they stuffed the boxes into the drawers and planned their sleeping arrangements for the night. They retired to bed after finishing the food they had brought for the picnic. Rahim awoke from his sleep after hearing a loud boom and then another sound that was louder than the first, as if someone was groaning. By calling, he awoke his other pals. The noise was also heard by them. They were all terrified. "What is that sound and where is it originating from?" Fahim inquired. They jumped out of bed and began seeking for the source of the noise. As the other was turned off, they realized the lower volume noise was coming from the bottom floor. They went downstairs and began looking for the source of the noise. Karim was startled to discover a door hidden beneath a mat on the floor. He summoned his companions and carefully opened the door, only to discover that the noise was coming from underground. They discovered a stairwell leading down. They decided to take it one at a time. They began descending the stairwell. Karim was the first to descend the stairwell, followed by Rahim and Fahim. Karim noticed something at the bottom of the stairwell. There were three individuals in the room when he saw it. He instructed his companions to come to a halt. When he looked inside the room, he noticed two individuals working on a machine, which was the source of the noise. Karim then said, "Now I recall the many sorts of paper we discovered. They are made of parchment paper and are used to produce counterfeit money. The unlawful money is made by a gang of criminals." The police were alerted, and all of the criminals were apprehended straight away.

চিত্রশৈলী ও ফটোগ্রাফি

আরশান বিন শামস
কলেজ নং : ১২৭১৮
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (দিবা)

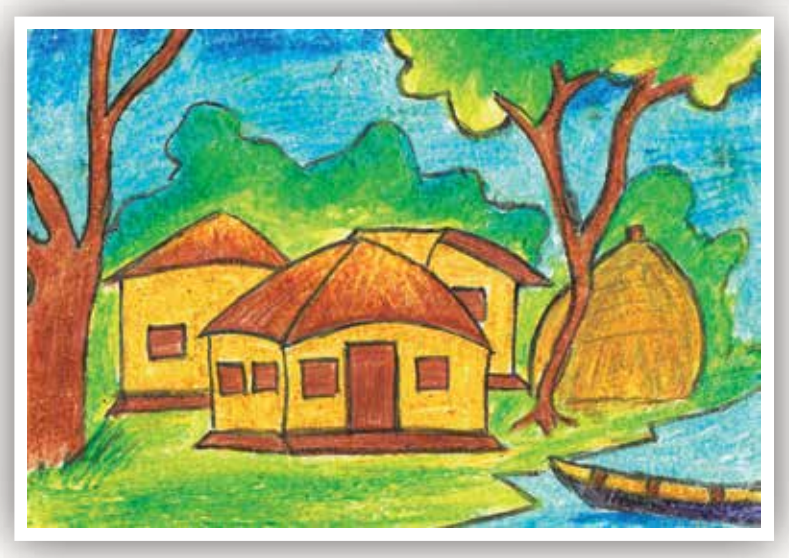

মোঃ সাকিবুর রহমান ভূইয়া
কলেজ নং : ১৮৩৪৬
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : বি (প্রভাতি)

অনিন্দ সুফিয়ান বাসার
কলেজ নং : ১২৭১৪
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (প্রভাতি)

মোঃ আশফাকুর রহমান মাহিন
কলেজ নং : ১৮২৭৮
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : বি (প্রভাতি)

অম্লান কুমার নাগ
কলেজ নং : ১২৭০৯
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

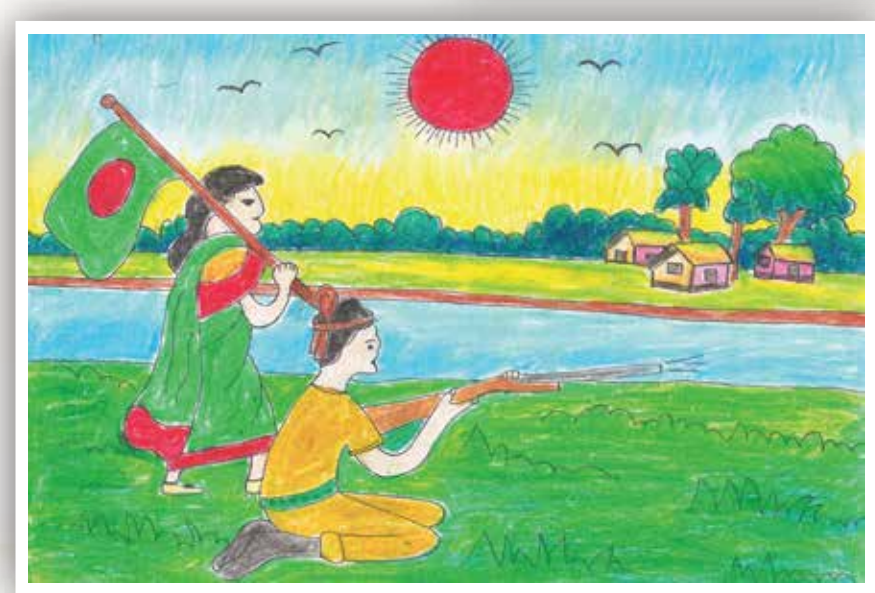

মাহমুদ উল আরাফাত
কলেজ নং : ১২৭২৩
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (দিবা)

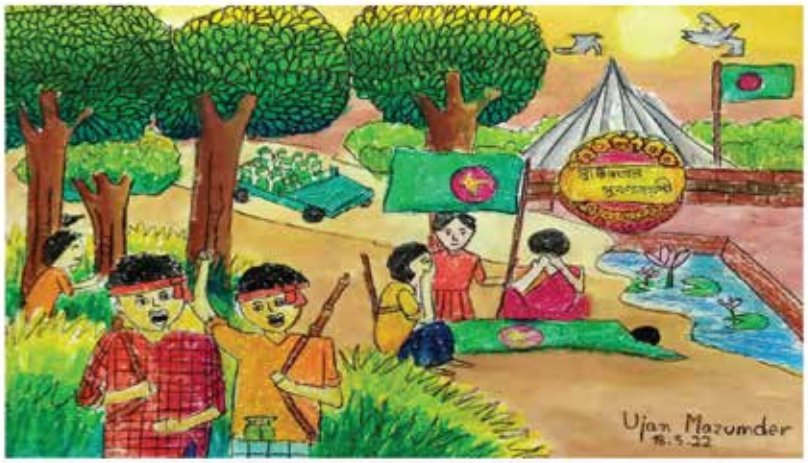

উজান মজুমদার
কলেজ নং : ১৭৮৫৬
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (প্রভাতি)

মুশতাক সিদ্দিক
কলেজ নং : ১২৮৬০
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ডি (দিবা)

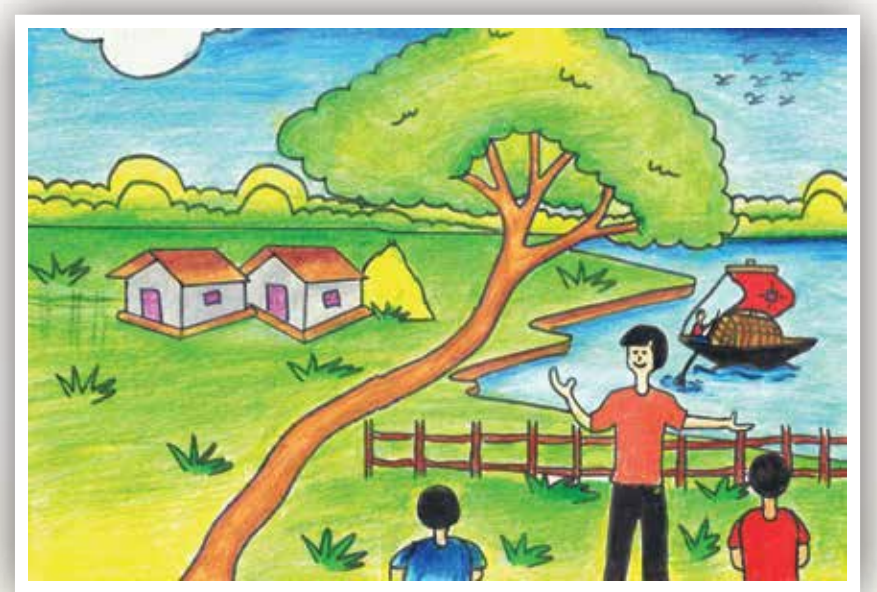

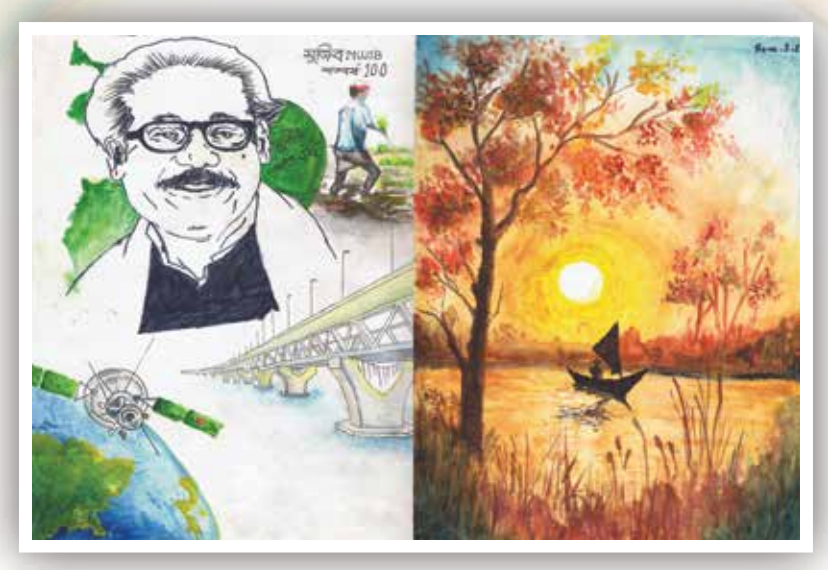

এইচ এম সিলমী সোহায়েল
কলেজ নং : ১৫২৩৫
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (প্রভাতি)

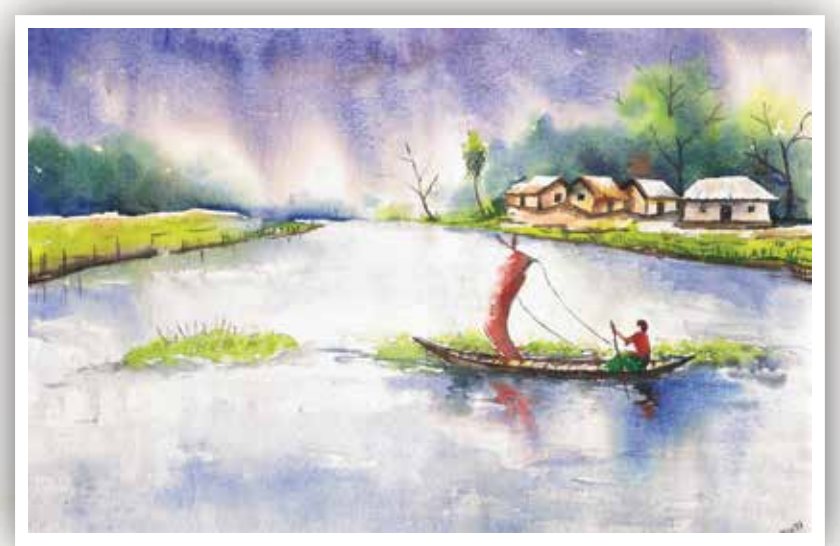

আবতাহী নুর
কলেজ নং : ৮৫৫৯
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ঘ (দিবা)

আবতাহী নুর
কলেজ নং : ৮৫৫৯
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ঘ (দিবা)

তানভীর শাহাদৎ রাজ
কলেজ নং : ৮৫৫৯
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (দিবা)

নাহিয়ান মাহমুদ
কলেজ নং : ১৮৪৭৯
শ্রেণি : নবম, শাখা : ক (প্রভাতি)

নাফিজ শাহরিয়ার
কলেজ নং : ১৮০২৮
শ্রেণি : দশম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

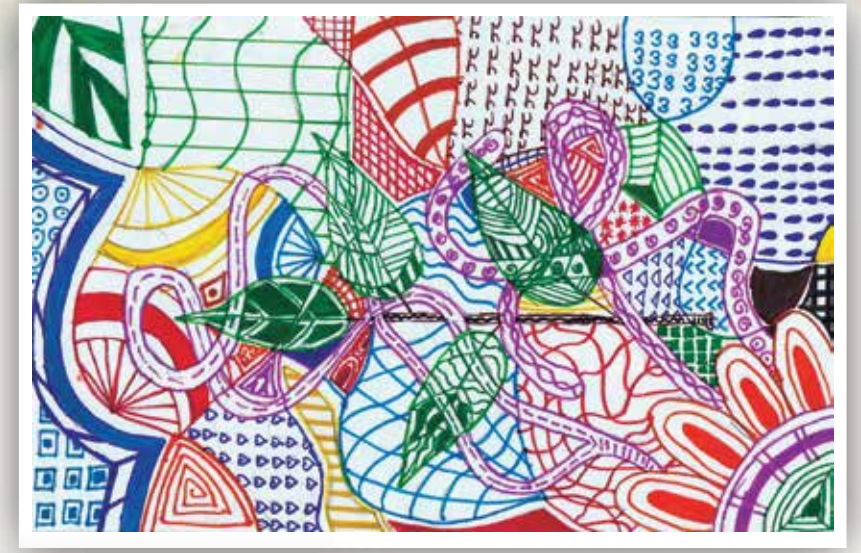

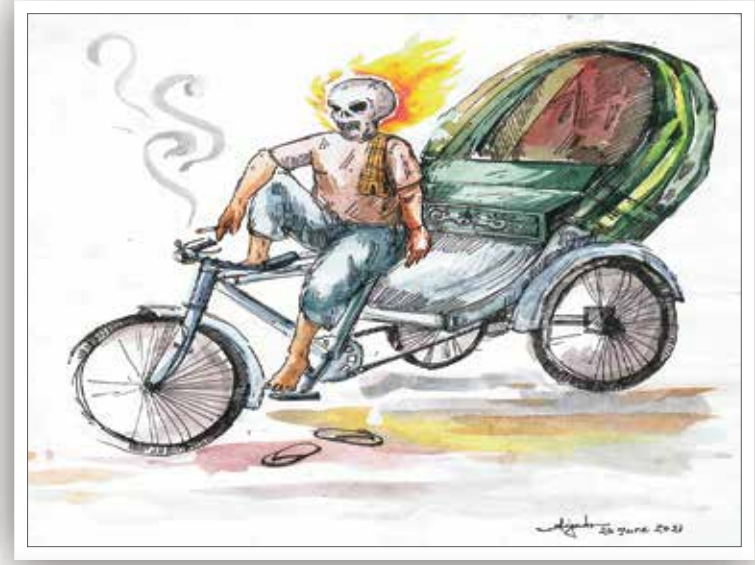

একান্ত শর্মা
কলেজ নং : ১৮০৯৬
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (প্রভাতি)

ক্লাব পরিচিতি

মিউজিক ক্লাব

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত অতিমারীর কারণে জনজীবনের প্রাণচাঞ্চল্যে স্থবিরতা বিরাজ করছে। থমকে রয়েছে মানবজাতির স্বাভাবিক জীবনধারা।

এই অতিমারির কারণে উদ্ভূত নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য ধরে রেখে তাদের উজ্জীবিত রাখার প্রয়াসে রেমিয়ান্স মিউজিক ক্লাব আয়োজন করেছে কিছু অনলাইন কর্মশালা ও লাইভ সেশনের।

এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০২১ সালে কলেজের ৬১ বছর পূর্তিতে উক্ত ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত হয়েছে "ডিআরএমসি ন্যাশনাল ভার্চুয়াল হামদ-নাত কম্পিটিশন"। এটি অত্যন্ত আনন্দের এবং একই সাথে গর্বের যে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে রাজধানীসহ সারাদেশের নানা প্রান্তের ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

ক্লাবের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ৫টি জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণ করেছে দেশের নানা প্রান্তের অসংখ্য শিক্ষার্থী। পাশাপাশি ক্লাবের পক্ষ থেকে এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সঙ্গীতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত মাসিক কর্মশালা, অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজিত হয়। প্রতিবছর থানা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ক্লাবের সদস্য শিক্ষার্থীরা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে তাদের মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

ক্লাব-মডারেটর এবং কো-মডারেটর হিসাবে ক্লাবটির সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করছেন এক জন প্রধান সমন্বয়কারী শিক্ষক ও এক জন সহ-সমন্বয়কারী শিক্ষক এবং ক্লাবটির কার্যনির্বাহী পরিষদে দায়িত্বরত আছে ১৫ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া স্বেছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে ৬০ জন সঙ্গীতানুরাগী শিক্ষার্থী।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি গৌরবোজ্জ্বল ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের তত্ত্বাবধানে ১৮টি ক্লাব বিভিন্ন বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে চলেছে, যাদের মধ্যে অন্যতম হলো "রেমিয়্যান্স মিউজিক ক্লাব"।

২০১৬ সালে কিছু নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গীতানুরাগী শিক্ষার্থীর উদ্যোগে জন্ম লাভ করে সঙ্গীতচর্চার জন্য বিশেষায়িত এ ক্লাবটি। সেই ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে ইতোমধ্যেই ক্লাবটি দেশের শীর্ষস্থানীয় তারুণ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর একটি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি তাদের সুপ্ত সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ এবং মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধনই ক্লাবটির মূল লক্ষ্য। সময়ের পরিক্রমায় ক্লাবটির কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ক্লাবটি বিশ্বাস করে, এ ধরনের আযোজন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর ও শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎকর্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। করোনাকালীন এ বিরূপ পরিস্থিতিতে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ ধরনের আযোজনসমূহে কলেজসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসংখ্য শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এটিই প্রমাণ করে যে তরুণ প্রজন্ম আধুনিক প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আসার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক ডিজিটালাইজেশনের এই প্রচেষ্টা এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সহ-পাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের একটি ক্ষুদ্র অংশ হতে পেরে রেমিয়্যান্স মিউজিক ক্লাব অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

ইসলামিক কালচারাল ক্লাব

(DRMC Islamic Cultural Club-DICC)

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ১৯৬০ সালে ঢাকার কেন্দ্রস্থল মোহাম্মদপুরে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ইসলামিক জ্ঞান চর্চায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কলেজে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আর্ট, সঙ্গীত, খেলাধুলাসহ অনেকগুলো ক্লাব থাকলেও ইসলামিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতি পালনসহ বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজনের জন্য আলাদা কোন ক্লাব ছিল না। সে অভাব পূরণে ২০২১ সালের ৬ মে প্রতিষ্ঠিত হয় ডিআরএমসি ইসলামিক কালচারাল ক্লাব। ক্লাবের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও ক্লাবের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই ক্লাবের মডারেটর ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্যারের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য কার্যনির্বাহী পরিষদ। পরিষদের সকল সদস্য এবং ক্লাবের যোগদান করা স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় সফলভাবে সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এই ক্লাবটি। ক্লাবের প্রতি জন সদস্যই এক একজন দিশারী।

শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদ ও মাদকের ভয়াল থাবা থেকে মুক্ত করে ইসলামের বাস্তব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মর্মবাণী সবার নিকট ছড়িয়ে দেওয়া এবং ইসলামিক জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাবটি। সকল ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামের সত্য ও শান্তির আবহ প্রতিষ্ঠা কল্পে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি প্লাটফর্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ক্লাবটি। এই প্রচেষ্টায় দেশের সকল কোমলমতি শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করার জন্য আমাদের রয়েছে একগুচ্ছ পরিকল্পনা।

কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ স্যার, ক্লাব কো-অর্ডিনেটর স্যার এবং ক্লাবটির মডারেটর স্যার-এর দিক নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি ইতোমধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকলের নজর কেড়েছে। এরমধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬১ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত "ভার্চুয়াল ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভাল" ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ডিআরএমসি ইসলামিক কালচারাল ক্লাব আয়োজিত "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ডিআরএমসি ন্যাশনাল ইসলামিক কালচারাল ফেস্টিভাল ২০২১" বিশেষভাবে ইতিবাচক প্রভাবের সূচনা করেছে।

এর মধ্যে গত বছর ১৩ নভেম্বর মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে "ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ডিআরএমসি ন্যাশনাল ইসলামিক কালচারাল ফেস্টিভাল ২০২১" ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয়। করোনা প্রকোপের কারণে ইভেন্টের ৬টি সেগমেন্ট অনলাইনে অনুষ্ঠিত হলেও ফেস্টিভালে ছিল কুইজ, মুকাভিনয়, ট্যালেন্ট হান্ট, ইসলামিক ডকুমেন্টারি ও মুভি, পুরস্কার বিতরণী, কলরব ও Truth of Ummah ব্যান্ড পারফর্মেন্স ইত্যাদি আয়োজন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যার এবং ক্লাবটির জেনারেল সেক্রেটারি আহনাফ ফাহাদ উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এরপর নানা আয়োজনের পর বিকেলে ক্লাবের সভাপতি এনায়েত উদ্দিন প্রধান, মডারেটর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্যার এবং চিফ ক্লাব কো অর্ডিনেটর মোহাম্মদ নূরুন্নবী স্যার এবং প্রধান অতিথি হিসেবে কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যার বক্তব্য রাখেন। এরপর বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের মধ্যে ক্রেস্ট, বই, সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং স্পন্সর, পার্টনারদের ও অতিথিদের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। সর্বশেষ কলরব ব্যান্ডের বিভিন্ন ইসলামিক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। জঙ্গীবাদ ও মাদকের থাবা থেকে ছাত্রসমাজকে রক্ষা করে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও সৌন্দর্য সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ইভেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী আমন্ত্রিত অতিথি এবং আয়োজকেরা।

ইতোপূর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও অদূর ভবিষ্যতে যাকাত অলিম্পিয়াড, ক্যালিওগ্রাফি, কুরআন বেইজড কুইজ, হাদিস বেইজড কুইজ, শরিয়াহ বেইজড কুইজ, আকাইদ বেইজড কুইজ, কুরআন তিলাওয়াত, আজান, হামদ, নাত, নাশিদ, দেশাত্মবোধক গান, ইসলামিক আর্ট-ক্রাফটসহ ইভেন্ট সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র ফেস্ট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি।

ইসলামে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও বরেণ্য সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি। মুহাম্মদ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামলের ঐশ্বর্যপূর্ণ সংস্কৃতি বিশ্বময় ব্যাপকভাবে সমাদৃত। কিন্তু একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে সেই বিষয়গুলো দুঃখজনকভাবে আমাদের অধিকাংশের কাছেই অপরিচিত, অজানা। সেই সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির চুম্বক অংশ হলেও অত্র ক্লাবের ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর।

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের বিশাল-বিস্তীর্ণ জনপদে শতাব্দীর পর শতাব্দী শাসনকালে ইসলামি সংস্কৃতির যে বীজ রোপিত হয়েছিল তা একসময় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে তার কল্যাণের ভাগিদার বানিয়েছিল বিশ্ববাসীকে। কর্ডোভা থেকে বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপল থেকে তুস, বুখারা থেকে সমরখন্দ, খোরাসান থেকে আগ্রা ইসলামি সংস্কৃতির যে আভিজাত্যিক হিতকর স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছিল তার লালসামুক্ত নিঃস্বার্থ ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। তার কিয়দাংশ হলেও প্রকাশের চেষ্টা থাকবে আমাদের ভবিষ্যৎকল্পে।

জাবির ইবনে হাইয়ান, মুসা আল-খাওয়ারেজমি, ইবনে সিনা, আল বিরুনি, ইবনে বতুতাসহ সহস্রাধিক মুসলিম বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ইসলামি সংস্কৃতির মর্ম প্রকাশ্যে নিখাদ আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠ প্রদর্শনে নিজেদের জীবন-যৌবন তিলে তিলে ক্ষয় করে মানব কল্যাণে যে অবদান রেখেছিলেন শত সহস্র নোবেল দিয়েও তার প্রতিদান সম্ভব নয়। অথচ তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত এমনকী এর ইতিহাসও আমাদের নাগালের বাইরে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তা আমাদের ক্লাবের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শুধু প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে নয়, বরং তা ছাড়িয়ে সমগ্র দেশ ও জাতির নিকট ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কল্যাণময় ধারা প্রবাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই ক্লাবের পথনির্দেশকবৃন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য রইল ক্লাবের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ইসলাম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক অভিনব প্রদর্শনী দেখা যাবে এই ক্লাবের মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ। সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফিজ।

REMIANS LANGUAGE CLUB

Dhaka Residential Model College

INTRODUCTION

Language is the attire of metaphysics. While language plays an important role in our lifespans, there are decisions you can make that can improve your chances for a longer and more productive life. It is a conventional system. Language can be likened to a play with an enormous volume and mosaic characters. Remains Language Club is a student governed club of Dhaka Residential Model College which runs various language related activities for the students of the whole nation. RLC has moved forward step by step and gradually expanded its reach beyond the walls of Dhaka Residential Model College. It has continued its rise and it is a torch bearer for not only the students of Dhaka Residential Model College but also every language lover in every corner of the nation. RLC started its journey in 2012 with support, guidance and patronization of Colonel (Retired) Md Kamruzzaman Khan.

Our first club Moderator was Dr. Md. Nurunnabi sir. Currently the Chief Patron of our club is Brigadier General Kazi Shameem Farhad(ndc,psc), Chief Co-ordinator Md. Nurun Nabi, of all the 18 clubs of Dhaka Residential Model College and our club Moderator is Muhammad Mynuddin, who is lecturer in English of Dhaka Residential Model College.

Language is the attire of metaphysics. While language plays an important role in our lifespans, there are decisions you can make that can improve your chances for a longer and more productive life. It is a conventional system. Language can be likened to a play with an enormous volume and mosaic characters. Remains Language Club is a student governed club of Dhaka Residential Model College which runs various language related activities for the students of the whole nation. RLC has moved forward step by step and gradually expanded its reach beyond the walls of Dhaka Residential Model College. It has continued its rise and it is a torch bearer for not only the students of Dhaka Residential Model College but also every language lover in every corner of the nation. RLC started its

journey in 2012 with support, guidance and patronization of Colonel (Retired) Md Kamruzzaman Khan.

Our first club Moderator was Dr. Md. Nurunnabi sir. Currently the Chief Patron of our club is Brigadier General Kazi Shameem Farhad(ndc,psc), Chief Co-ordinator Md. Nurun Nabi, of all the 18 clubs of Dhaka Residential Model College and our club Moderator is Muhammad Mynuddin, who is lecturer in English of Dhaka Residential Model College.

REMIANS LANGUAGE CONTESTS

This year RLC has organized a Virtual Language Contest under a new executive committee. Like every year it has shown its self-conceit in the DRMC Virtual Language Contest. In former years the club had organized individual events and festivals and without any volatility, those can be narrated that it was a very successful event.

It was Decorated with more exciting events and some exciting new surprises. In response to the incredible audience we received this year, RLC hopes to put forward a couple of events and workshops which will be bigger and better.

As a gesture to the language of Palestine, we have arranged to write the words language, word, sentence and letter in Arabic at the bottom of each page.

Continuing this process and broadening the platform, Besides the impacts of COVID-19, this year for Celebrating 61 years of our Institution, Remains Language Club along with the clubs of Dhaka Residential Model College co-hosted the mega event combined named ÒVirtual National Mega Festival-2021".

We intended to publish our souvenir magazine Dhoni, this time the 7th Edition. This time it will be redesigned and elevated to a whole new level and we hope our participants are waiting eagerly for it.

In this event, our president, Syed Sajid gave the necessary instructions to run all the events led by RLC Executives. Md Jubairul Jabir - Vice President (Morning) and Fardin Islam - Joint Secretary, conducted the "Extempore Speech English Junior" and "Spelling Bee Senior" event together snugly.

On the other side of the page, our honourable Vice President (Day) - Ratul Debnath and General Secretary Quazi Fattah Munir administrated the "Extempore Speech English (Junior)" and "Spelling Bee (Junior)" event in given time. Also our honourable Treasurer Iftekhar Ahmed and Olympiad Secretary- Nazib Irfan Khan operated the "Extempore Speech Bangla (Junior) and (Senior)" event gingerly.

Our Organizing Secretary- Ahmed Munirul Islam played a vital role when it came down to organise all the events of our festa nd maintained the event schedule. Graphics Secretary - Sadman Sakib Alvee did all the graphical work and virtual management in our events. Our Publication Secretary - Sunve Hasan played a signif- icant preamble in order to circulate the events of our fest amongst the vast number of students across the country.

We assume RLC will keep their love and affection of language in their heart flawless so that it can continue to do such great things so as to encourage the following generations to protect their language just like the language martyrs did in 1952.

Remains Language Club is also contained with many notable alumni. Many former executive members are serving in the military. Our former treasurer (Executive Committee 2017-18) is a Midshipman in Bangladesh Naval Academy. Besides, we have many alumni who are dedicated researchers.

Our former General Secretary Ahmed Yesvi Rafa (Executive Committee 2018-19) is currently studying Biomedical Science at Western Michigan University. Sakib Mahmud (Office Secretary, EC 2017-18) is studying finance in Dalhousie University, Canada and many alumni from this club are serving in different terminals worldwide.

“A special kind of beauty exists which is born in language, of language, and for

language.” Gaston Bachelard

The students of DRMC should look up to their elders and join Remains Language Club for many reasons. Remains Language Club broadens the mind of the students who seek the knowledge of language. Also they can acquire the knowledge of their mother tongue more by joining RLC which

augments the love towards their mother tongue. The senior advisors of RLC as of today, are all in a successful position where they making a difference to make this world a better place for all of us. They help us regarding all the RLC events so that we don't stumble. We simply learn from the best. We hope this legacy will be continued.

"RLC Does It Like No One Else"

রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাব

সুচনা।

রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাব বা সংক্ষেপে RNEC (আরনেক) পরিবেশগত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভ এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মান্যবর অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশনায় একটি নতুন ক্লাব হিসাবে যাত্রা শুরু করে। ক্লাবটির মডারেটর হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রভাষক মোঃ ফরহাদ হোসেনকে। অতঃপর ক্লাবের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কিছু উদ্যমী ছাত্রদের নিয়ে গঠন করা হয় এক্সিকিউটিভ কমিটি। নবীন ক্লাবগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও 'আরনেক' ইতোমধ্যে ২০২০ সালের শুরু থেকে কলেজে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে ছাত্রদের যুক্ত করতে পেরেছে।

আমাদের ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচি বা পরিকল্পনা

- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।
- কলেজ ক্যাম্পাসে বা আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুল সম্পর্কে জানা।
- সেমিনার বা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাকরণ।
- রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া কর্মসুচি।
- একটি ক্লাব মিউজিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিবেশগত অলিম্পিয়াড/কুইজ/পোস্টার/প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।
- বিশ্ব পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন দিবসে ছাত্রদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্তকরণ।
- ক্লাব ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।

- আমাদের প্রকৃতি এবং দূষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে শিক্ষা সফর আয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যে অংশগ্রহণ।
- শিক্ষার্থীদের নিজের বাসায় বা পরিবারে সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সচেতনকরণ।
- স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে উৎসাহ দান ও জাঙ্ক ফুড বর্জন করতে সচেতনকরণ কর্মসূচি।
- শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের করিডোরগুলিতে হাউস প্লান্ট সজ্জাকরণ।
- শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশগত শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট উদ্ভাবন কর্মসূচি।
- স্থানীয় সমাজে পরিবেশগত কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।
- কলেজ লাইব্রেরিতে বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কিত বই, ম্যাগাজিনের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন ইত্যাদি।

রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাব গঠনের কিছুকাল পরেই সারা পৃথিবীতেই কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আমাদের দেশেও বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকায় ক্লাব কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। কিন্তু আমরা থেমে না থেকে অনলাইনে ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছাত্রদের পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। সরাসরি কিংবা অনলাইনে আমাদের ক্লাবের কর্মকাণ্ড ও অর্জনসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০০টি গাছের চারা রোপণ

২০২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে কলেজ ক্যাম্পাসে ১০০টি বৃক্ষ রোপণের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মান্যবর অধ্যক্ষ স্যারের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ক্লাবের অংশগ্রহণে কলেজে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

১ম 'আরনেক' অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা

২০২০ সালের ৮ই এপ্রিল, রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাব ১ম 'আরনেক' অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। করোনভাইরাস মহামারীর কারণে প্রতিযোগিতাটি ভার্চুয়ালি করতে হয়েছিল। এই ইভেন্টে, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল দেড়শতাধিক, তাদের মধ্যে ১০ জন বিজয়ী ছিল।

১ম রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাব অনলাইন উৎসব

রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাবটি ২০২০ সালের ২০ শে জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১ম ডিআরএমসি অনলাইন নেচার এন্ড আর্থ ফেস্টিভাল বছরের অন্যতম গৌরবময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ৯টি উত্তেজনাপূর্ণ ইভেন্টে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৭০০ এর অধিক ছিল যা ক্লাবের জন্য একটি বিশাল অর্জন। ৫টি ক্যাটাগরিতে ৮৭ জন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয়েছিল। দেশব্যাপী বিভিন্ন ২৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা এই দুর্দান্ত উৎসবে তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্বাসেডর হিসাবে কাজ করেছিলো।

১ম বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১

নটরডেম কলেজের উদ্যেগে বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার বিখ্যাত ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ক্লাব মিলে প্রথমবারের মতো আয়োজন করে বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১ যা অনলাইনভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রতিটি ক্লাব একটি করে ইভেন্ট হোস্ট করার দায়িত্ব নেয় এবং ২২ এবং ২৩শে এপ্রিলের দুই দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় সফলভাবে। রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাবটি বাংলাদেশ আর্থ সামিট-২০২১ এর একটি ইভেন্টের হোস্ট করেছিল যা ছিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবসকে সামনে রেখে ডিজিটাল পোস্টার ডিজাইনিং প্রতিযোগিতা। এ ইভেন্টে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৬৭ জন অংশগ্রহনকারীর মধ্যে ৩ জন বিজয়ী হয়েছিল।

অনলাইন ডিআরএমসি ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভাল-২০২১

৫ই মে ২০২১, স্বনামধন্য ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬ দিনব্যাপী অনলাইন ডিআরএমসি ন্যাশনাল মেগা ফেস্টিভাল এর আয়োজন করা হয়। এটির উদ্বোধন করেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যার। উক্ত ফেস্টে রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাবের 'ভারচুয়াল অনলাইন নেচার ফিয়েস্তা-২০২১' নামে প্রতিযোগিতায় ২টি ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। আমাদের প্রথম ইভেন্ট নেচার ও আর্থ অলিম্পিয়াড-এ ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলার স্বনামধন্য স্কুল ও কলেজের প্রায় ৩০০এর অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে গ্রিন জার্নালিজম প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬০ এর অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১ উদযাপন

৫ই জুন ২০২১ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ৭দিন ব্যাপী বৃক্ষ রোপণ উৎসব শুরু হয়। এ উৎসব পরিচালনার দায়িত্বে ছিল রেমিয়ানস নেচার এন্ড আর্থ ক্লাব। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিব ও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ছাত্র ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে এ বৃক্ষ রোপণ অভিযানে ৩য় থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল সেকশনের নির্বাচিত ছাত্ররা তাদের নিজ হাতে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি করে গাছের চারা রোপণ করে। ৩০০ এর অধিক বৃক্ষরোপণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ ও প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিল এ উৎসবের লক্ষ্য।

১ম ডিআরএমসি-ব্লুপ জাতীয় প্রকৃতি উৎসব-২০২১

২৮-২৯ অক্টোবর-২০২১ আরনেকের আয়োজনে ১ম ডিআরএমসি জাতীয় প্রকৃতি উৎসব-২০২১ উদযাপিত হয় যাতে দেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা মোট ১৮টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মান্যবর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যার উক্ত প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আমরা ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্রদের পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রেখে তাদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি সমাজে নেতৃত্ব দানের গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করছি। শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলা এ ক্লাবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ডিআরএমসি সমাজসেবা ক্লাব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ক্লাবসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ক্লাব হচ্ছে ডিআরএমসি সমাজসেবা ক্লাব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজসেবার বোধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি মহোদয়ের নির্দেশে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্লাবটি শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সমাজ সেবামূলক বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এই ক্লাবের কার্যক্রমসমূহ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিকতা চর্চার ব্যবহারিক ক্লাসরুম হিসেবে কাজ করছে।

ক্লাবের মূলনীতি : সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ

ক্লাব সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ :

* শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় বিভিন্ন সময়ে শীতার্ত ও ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ।

* প্রাক্তন রেমিয়ানদের সংগঠন ORWA এর সহায়তায় করোনা মহামারিকালে কর্মহীন মানুষদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ।

* বর্ষা মৌসুমে রিক্সা চালকদের মধ্যে রেইনকোট ও খাদ্যবিতরণ।

* শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েবিনারের আয়োজন।

* সমাজ সচেতনার অংশ হিসেবে ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা।

* প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কলেজ ক্যাম্পাস ও এর বহিরঙ্গনে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা ।

* অসহায় ও পথশিশুদের মধ্যে উন্নত মানের খাদ্য, শিক্ষা সামগ্রী ও পোশাক বিতরণ।

* দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বই ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় দরিদ্র মানুষদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।

* দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিকতার বোধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভার্চুয়াল ন্যাশনাল মেগা ভ্যাস্টিভ্যাল-২০২১ এর আয়োজন।

* প্রতি রমজানে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর ইফতার সামগ্রী বিতরণ।

* নিয়মিত রক্তদান ও রক্তদানে সবাইকে উৎসাহিতকরণ।

* জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসের তাৎপর্য কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তুলে ধরা।

* ক্লাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ এর মাধ্যমে নিয়মিত সমাজ সচেতনামূলক প্রচারণা প্রভৃতি।

ক্লাবের সদস্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া :

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে থাকে। সফলভাবে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের পর; স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে সদস্য নির্বাচিত করা হয়। সদস্যদের মধ্য থেকে দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলি বিবেচনায় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ক্লাবের সদস্য হতে পারেন। ষষ্ঠ থেকে থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারেন।

REMIANS ART CLUB

OFFICIAL EXECUTIVE PANEL OF 2021-2022

রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব

ফিরে দেখা রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের ২০২১-২০২২ যাত্রা

পৃথিবীতে নির্মলতম, বিশুদ্ধতম কিংবা সরলতম কোন ভালোবাসার মাধ্যম, মনের লুপ্ত ভাব প্রকাশের কোন মাধ্যম যদি থাকে তবে সেটি বোধ হয় শিল্পা শিল্পের কোন ভাষার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় না কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাগজে কলমে বাঁধাই করা সনদের। আর সেকারণেই দেশব্যাপী প্রতিটি শিশু-কিশোর-তরুণদের শিল্পজগতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচরণে আগ্রহী করতে তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশ্যেই পথচলা শুরু হয় রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের।

করোনা প্রকোপ যেভাবে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছে তদ্রুপ ধুলিস্যাৎ করেছে রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের অসংখ্য সুযোগ এবং সম্ভাবনাময় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকেও; যার জ্বলন্ত উদাহরণ ২০২০ সালের জাতীয় আর্ট ফেস্ট আয়োজনে অপারগতা। তবুও কলেজের সকল ছাত্রদের ভালোবাসায়, ক্লাবের প্রতিটি সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ২০২১ সালের ৬ নভেম্বর আবারো পূর্ণ উদ্যমে এক দিবসব্যাপী জাতীয় আর্ট ফেস্টিভ্যাল 'আর্টসি ওভারল্যাপ ২০২১' এর আয়োজন করে রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব।

নিঃসন্দেহে করোনার আড়ম্বরহীন ব্যতিব্যস্ত এক নিরানন্দ জীবনের খাঁচা থেকে বেরিয়ে ডানা মেলে উড়বার জন্যে ছাত্রদের নিমিত্তে এই ফেস্টিভ্যাল একটি সক্রিয় অবদান পালন করেছে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

চিত্রাঙ্কন, কসপ্লে, দেয়ালিকাসহ নানান বহুমুখী প্রতিযোগিতার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব নিতান্তই সাদামাটা তবু রঙিন এক আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে ২০২১ সালে। এই আয়োজনের পেছনে যেমন ক্লাবের সদস্যদের অবদান অনবদ্য, অনুরূপভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের এই নিয়মিত প্রচেষ্টা একদিন বাংলায় আবার সেই শিল্প সমৃদ্ধ এক যুগের সূচনা করবে; যা দেশের সকল সম্ভাবনাময় শিল্পীদের নিজেদের শিল্প মানস, সৃজনী দক্ষতার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ করে দিবে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্যক্ত করা হচ্ছে যে আমাদের রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য সাম্প্রতিক নানান প্রতিযোগিতায় অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছে যা কেবল ক্লাবের জন্য নয়, বরং সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যেও এক গর্বের বিষয়। তাদেরই একজন আবতাহি নূর, যার কিছু অর্জনের মুহূর্ত উপস্থাপিত হল।

রেমিয়ানস আর্ট ক্লাবের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

REMIANS DEBATING SOCIETY

INTRODUCTION

Debate is the formal oral confrontation between two individuals, teams, or groups who present arguments to support opposing sides of a question,

generally according to a set form or procedure.Debating will help you develop critical thinking skills that are essential in daily life. Critical thinking is the ability to make well thought out and reasoned arguments while also questioning the evidence behind a particular conclusion or stance.

The Remians Debating Society was born on July 10, 2008 It was established by the students of S. S.C 2008 batch of Prabhati branch. Our love for effort, pursuit and debate lies behind our progress since birth. Gradually we have strengthened our position in the arena of debate, we have been able to highlight our own individuality. Currently the chief patron of our club is Brigadier General Kazi Shameem Farhad(NDC,PSC), Chief coordinator Md. Nurun Nabi , of all the 18 clubs of Dhaka Residential Model College. Our current club Moderator is Tareq Ahmed sir, who is lecturer in Bangla of Dhaka Residential Model College.

Activities of RDS

The primary goal of RDS was always to focus on our homegrown talents.To teach the basics of critical thinking and debating in general . We arrange debate sessions among the students quite frequently.Teams representing RDS and DRMC have always tried their best to conquer every tournament they participate in. RDS has always been a bilingual debating club,

winning almost every Bangla and English debate tournament there is. Also with the support of our Honourable principal sir, club moderators, senior advisors and the executive committee members has organised 11 consecutive National Debating festivals at our college premises. During the club's long 14 year journey ,the members have tried their best to uphold their love and enthusiasm for debate.we have organised intra tournaments, regular debate sessions, workshops on Formal debating ,motion approach E.T.C. Along with the events and workshops each year we publish a souvenir-magazine of our festival. Every year we pledge to cherish everyone's debating spirits by publishing “BAGMI”. This souvenir features interviews and write ups from some of the brilliant minds of our times.

Our Activities

RDS has always been eager to conquer tournaments invariably. RDS, being a bilingual club, has sent teams for both Bangla and English debate tournaments every year.

We hope that the future members of the club show the same passion and love for the debating culture and nourish the same moral values that RDS upholds. Do be a part of the amazing legacy RDS upholds. জয়তু বিতর্ক, জয়তু RDS

DRMC United Nations Association

INTRODUCTION

Dhaka Residential Model College Model United Nations Association (DRMCMUNA) is a new initiative. The club was formed in the year 2019. It was created with a desire to provide people with a chance to practice public speaking as well as flaunt their diplomatic and leadership skills. Dhaka Residential Model College Model United Nations Association (DRMCMUNA) focuses on improving socializing skills, communication skills, public speaking ability, comprehension ability and research cooperation, effort, negotiating, writing abilities and so on. Such programs assist students in achieving their goals.A new degree of communication abilities that plays an important role important part in becoming a real leader in the twenty-first century.

The ambition of DRMCMUNA is to develop the interpersonal skills of students so that they can reach the highest peak in their respective careers. DRMCMUNA particularly focuses on developing several skills which are common among all the leading professions around the world.

Achievements of DRMCMUNA:

Shortly after its establishment in 2019, DRMCMUNA hosted its first workshop entitled "Introduction to MUN" which had a prime focus on the President of IABC, Vice-President of IABC and a former Remian: Shakib Mahbub Ahmed and · BRAC University alumni: Shaumik Hossain. The most interesting part was the speech of our honorable Principal where he encouraged the youth. The DRMCMUNA club participated in DUMUN, BUPMUN, BUFTMUN, NDCMUN and DUNMUN before all of the clubs' works were closed due to the

pandemic and was honored to receive the "Outstanding Delegation Award" at the IIMUN conference. After the Coronavirus pandemic, the DRMCMUNA Club sent its largest team to date to the "Eventra Model United Nations General Assembly 2021". Mesmerizing the audience they won the "Best Delegation Team" award. They also achieved the 'Outstanding Delegation Award' and the ‘Honorable Mention'.

On March 3-5, a delegation of 20 delegates from Dhaka Residential Model College attended the "Notre Dame College Model United Nations Conference 2022," which was hosted at their own campus in the center of Dhaka city. The Dhaka Residential Model College Model United Nations Association (DRMCMUNA) Delegation team received eight individual awards.

The same passion and love for the club is expected to continue when the new members become part of the legacy that the club boasts about.

DRMC IT Club

DRMC IT Club is an organization that serves and enriches the knowledge of the passionate and tech savvy students who are eager to dig deep into the vast world of technology. Every club are different than others, because every club determines themselves in different mottos, different views, etc. DRMC IT CLUB is one of the biggest IT Club in Bangladesh, with extremely intelligent bunch of individuals as their executive panel who works diligently towards the future of tech youths and making a bigger pathway for them to shine in their very own inventions.

HISTORY :

Since 2016, chatters went on to create a club inside Dhaka Residential Model College which could serve the desires of thousands of students & enrich their skills in Information Technology. Only few could take the necessary steps to fill in the gap between dream and reality. Lucky for HSC Batch 2018, we had that ambition & workforce to create a fully functional IT Club in Dhaka Residential Model College.

At the beginning of the 2017, foundation & logistical process of creating DITC got into motion. Along with the help of our moderators and ICT Department of Dhaka Residential Model College, everything processed really fast. Within a month we had official approval from College Authority to start our work on the Club. The official birthdate of DITC is 22 February, 2017. DITC's official opening ceremony took place on the morning of Monday, 31 July 2017. College officials, students and our Honorable Ex. Principal Brigadier General Abdul Mannan Bhuiyan sir were present during the ceremony. Before the ceremony could start, our beloved Abdul Mannan Bhuiyan sir gave his remarkable speech. And finally our beloved DRMC IT CLUB was born with ambitions being high and with a view to make this club the best tech club in the whole country.

VISION : The world now has the largest generation of young people in history. As they are the best agents of change, many young merits are becoming more prone to rejecting the status quo and demanding a much better future.

Rasel Ahmed
MODERATOR
DRMC IT CLUB

Md. Asique Iqbal
MEMBER
SECRETARY
DRMC IT CLUB

The purpose of DRMC IT CLUB shall be to serve and enrich the knowledge of the passionate and tech savvy students who are eager to dig deep into the numeral world of technology. Mastering the technology with proper skill and discipline someday may take us to the competitive world of tech dominion and leadership. We shall enlighten the souls of many sleeping talents among us and others. No country can improve without the necessary growth of IT. Above all, it is also our duty to serve this country with proper skills and knowledge on "Information Technology". The establishment of DRMC IT CLUB will guide us to a better technology oriented future.

Achievement :

Throughout the years of this prestigious IT club this club has not only seen bigger, mentionable achievements but also has received very prestigious awards since 2017 it's official launch.

VISION :

The world now has the largest generation of young people in history. As they are the best agents of change, many young merits are becoming more prone to rejecting the status quo and demanding a much better future. However, nothing is possible until they are prepared for the upcoming era of science and technology. So, our club envisions a world where tech plays the crucial role of connecting nations to socio-economic norms. Therefore, we are looking forward to a world where everyone has a chance of fair play in terms of learning such skills.

The purpose of DRMC IT CLUB shall be to serve and enrich the knowledge of the passionate and tech savvy students who are eager to dig deep into the numeral world of technology. Mastering the technology

with proper skill and discipline someday may take us to the competitive world of tech dominion and leadership. We shall enlighten the souls of many sleeping talents among us and others. No country can improve without the necessary growth of IT. Above all, it is also our duty to serve this country with proper skills and knowledge on "Information Technology". The establishment of DRMC IT CLUB will guide us to a better technology oriented future.

OUR FUTURE GOAL :

The youths are not only the leaders of tomorrow but the leaders of today. Empowering the youths of our nation ensures future prosperity and establishment. So our club aims to shed the spotlight on young achievers and change-makers who are yet to put a dent in the universe. We are serving our purpose through –

• Serving and enriching the knowledge obtained in the field of tech

• Identifying young minds who are working relentlessly to reshape the system and move the country forward.

• Equip young innovators with necessary exposure and make them aware of their own true potential.

• Create the ultimate platform for intellectual creativity and curiosity to flourish

When the youth are provided with the perfect medium of learning, they are enlightened to a point where the ensure society becomes a good place for all to live. Empowering young champions is the first and foremost step needed to empower the whole nation. And youth empowerment can only be guaranteed when their latent talents are dug deep into the numeral world of technology.

With each passing year new executive panel members are assigned for the future betterment of the club with the approval of the moderators and teachers.

বিজনেস এন্ড ক্যারিয়ার ক্লাব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮টি ক্লাবের মধ্যে ডিআরএমসি বিজনেস এন্ড ক্যারিয়ার ক্লাব অন্যতম। ২০১৯ সালের শেষের দিকে কলেজের বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যারের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়।

দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ব্যবসায়ের আলো পৌঁছে দেওয়া এবং আধুনিক ব্যবসায় সফলতা অর্জনে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চার করার জন্য দেশের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজনেস ক্লাবের কোনো বিকল্প নেই। ক্যারিয়ার গঠনে চাকরির পেছনে না ছুটে নতুন ব্যবসায় নিজের ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবে। করোনা পরিস্থিতি খারাপ থাকায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি কোনো কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও বিজনেস ফেস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে স্টার্ট আপ বা ব্যবসায় উদ্যোগ (অনলাইন/অফলাইন) কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপস্থাপন করা হবে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিজনেস আইডিয়া সব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজনেস ফেস্টের আয়োজন করা হবে।
- ক্যারিয়ার গঠনে ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপস্থাপন করা হবে।
- আইডিয়া বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেওয়া হবে ইনশাহ আল্লাহ।

মোঃ আহসানুল হক, মডারেটর, বিজনেস এন্ড ক্যারিয়ার ক্লাব।

ডিআরএমসি ফটোগ্রাফি ক্লাব

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ পাঠ্যক্রম এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম এর কারণে খুব জনপ্রিয় এবং স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় ২০১৪ সালে গঠিত হয় 'DRMC আর্ট এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব।' 'DRMC ফটোগ্রাফি ক্লাব' হল DRMC-এর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ক্লাবগুলির মধ্যে একটি। বছরের পর বছর ধরে ক্লাবের গৌরব এবং সফল কার্যক্রমগুলোর কারণে এটি সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীলতার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালে এই ক্লাবের জন্মের পর থেকেই স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ডেডিকেটেড এক্সিকিউটিভ এবং প্যানেল সদস্যরা চমৎকার দক্ষতার সাথে কাজ করে আসছেন। কঠোর পরিশ্রমী ক্লাবের সদস্যরা ক্লাবটিকে ফটোগ্রাফি প্রকাশ করতে পেশাদার এবং নবাগত ফটোগ্রাফারদের উদ্ভাবনী প্রতিভার খোঁজ ও প্রকাশ করতে সহায়তা করেছিল।'DRMCPC' ২০১৪ সালে তার প্রথম ফেস্ট এর আয়োজন করে। যা কলেজের অন্যতম সফল একটি ফেস্ট হিসেবে বিবেচিত এবং এইভাবে ক্লাবটি অন্যান্য মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবগুলির মধ্যে একটি বিশাল খ্যাতি তৈরি করে। বছরের পর বছর এই মর্যাদা ধরে রেখে 'DRMCPC' সেইসব ব্যক্তিদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে, যাদের ফটোগ্রাফি করা শুধুমাত্র শখই নয় বরং জীবনের ক্যারিয়ার গঠনেরও একটি মাধ্যম হতে পারে। ২০১৪ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর ফেস্ট আয়োজন করার পর ২০১৮ সালের 'আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যা' এই ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে সফলতম এবং খ্যাতিমান ফেস্ট হিসেবে আয়োজিত হয়েছিল যা ক্লাবের খ্যাতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং জনসাধারণের সাড়া উৎসবটিকে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালেও 'DRMCPC' অন্যতম সফল একটি ফেস্ট এর আয়োজন করে। এছাড়াও 'DRMCPC' ফটেগ্রাফি প্রদর্শনী এবং অন্যান্য ফটোগ্রাফি কর্মশালার মতো ইভেন্টগুলি চালু করেছে যা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং এর জন্য, ক্লাবটি তার অনন্যতা এবং সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ১৭ মার্চ, ২০২০ কোভিড-১৯ সমগ্র বিশ্বে বিধ্বংসী আকার ধারণ করার সাথে সাথে স্কুল-কলেজের বন্ধ হয়ে যায়। এমন ভীতিকর পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অফলাইন সিস্টেমে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্তায় প্রদর্শনী, কর্মশালা এবং ফেস্ট আগের মতো উপভোগ করা সম্ভব নয়। ফলে 'DRMC ফটোগ্রাফি ক্লাব' একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের ব্যাপক বিস্তৃতির সাহায্যে 'DRMC ফটোগ্রাফি ক্লাব' তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে অনলাইনের মাধ্যমে। ক্লাবটি তাদের

সদস্যদের ফটোগ্রাফি দক্ষতার উপর কাজ করেছে, সদস্যদের বিশ্বের বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের সাথে একটি নতুন সংযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া এই ক্লাব অনলাইন সিস্টেমে 'ভার্চুয়াল ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী এবং সেমিনার' আয়োজন করেছিল যা ফটোগ্রাফার এবং অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসা করেছিল। মহামারী থেকে বেরিয়ে এসে 'DRMC ফটোগ্রাফি ক্লাব' নতুনভাবে পুরনো উদ্যোগে পুনরায় তাদের কাজ শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় খোলার এবং পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা শুরু করার খুব শীঘ্রই 'DRMCPC' '৬ষ্ঠ তম জাতীয় DRMC ফটোগ্রাফি ফেস্ট ২০২১ এর আয়োজন করে। এই ফেস্ট ফটোগ্রাফার, অংশগ্রহণকারীদের এবং দর্শকদের দীর্ঘ বিরতির পর আবারো প্রদর্শনী কক্ষে তাদের কাজ দেখার সুযোগ দিয়েছে। উক্ত ফেস্টে একজন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের শিক্ষার অধীনে শিক্ষার্থীদের ফটোগ্রাফির বিষয়গুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করার জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। 'DRMCPC'-এর লক্ষ্য হলো জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফটোগ্রাফারদের জন্য একটি প্যাটফর্ম তৈরি করা। আলোকচিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি, দেয়াল পত্রিকা, কারুশিল্প কর্মশালা এবং অন্যান্য সহায়ক ইভেন্টগুলি উল্লেখযোগ্য। ক্লাবটির লক্ষ্য পেশাদার এবং অপেশাদার ফটোগ্রাফারদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। সেই কথা মাথায় রেখে ক্লাবটি সময়ের সাথে সাথে একটি ভার্চুয়াল মেগা ফেস্ট এবং কিছু গৌরবময় ইভেন্টের আয়োজন করেছে। মেগা ফেস্টে উপস্থিত ছিলেন আরিফ আমিন, এহসানুল সিদ্দিক অরণ্য, হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন সাহা, মিশুক আশরাফুল আউয়াল এবং দিন মুহাম্মদ শিবলীর মতো পেশাদার ফটোগ্রাফাররা। 'DRMC ফটোগ্রাফি ক্লাব' শিক্ষার্থীদের ফটোগ্রাফিতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকাশের সুযোগ প্রদান করে। ক্লাবটি অনেক ছাত্রের মন জয় করেছে এবং এখন এটি এমন একটি প্লাটফর্ম হয়ে উঠেছে যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের ফটোগ্রাফির প্রতিভা অন্বেষণ করতে এবং প্রদর্শন করতে পারে। DRMC ফটোগ্রাফি ফেস্ট ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি ফেস্ট এর অংশ হওয়ায় আমরা আশা করি যা সারা বিশ্ব থেকে তার ভার্চুয়াল প্রদর্শনীর মাধ্যমে ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী উদযাপন করতে পারে। ফটোগ্রাফার এবং ভবিষ্যতের ফটোগ্রাফিক প্রকল্পগুলিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পুরস্কারের পাশাপাশি নানাবিধ কার্যক্রমে 'DRMCPC' নিয়োজিত আছে। প্রদর্শনীর জন্য সেরা ছবি বাছাই করা হয় যেখানে বিজয়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া মাননীয় জুরি বোর্ড দ্বারা করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভালো ফটোগ্রাফার হতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি কর্মশালার সেশন থাকবে এবং প্রতি বছরের মতো এবারও 'DRMC ফটোগ্রাফি ক্লাব' '7th DRMC National Photography Fest 22' আয়োজন করতে চলেছে যা এই মার্চ মাসে সংঘটিত হবে। 'ডিআরএমসি ফটোগ্রাফি ক্লাব' রেমিয়ানদের জন্য তাদের লালিত ফটোগ্রাফি দক্ষতার সাথে নেতৃত্বের দক্ষতা, প্রজ্ঞার বিকাশ এবং ফটোগ্রাফির জগতে একটি নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার জন্য একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

$DR(MC)^2$

Numeros Regere Universi

DRMC Math Club

ক্লাব পরিচিতি ঃ রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গণিত ক্লাব DRMC Math Club। বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষার্থীও যেন গণিতকে ভয় না পায়, এমন একটি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ৬ আগস্ট থেকে যাত্রা শুরু হয় ক্লাবটির। ক্লাবটির মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করে তাদের মাঝে গণিতের আনন্দকে ছড়িয়ে দেয়া। ক্লাবটির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক গণিতের পাশাপাশি গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য যোগ্যরূপে প্রস্তুত করে তোলা। সে লক্ষ্যে গণিত ক্লাব নিয়মিত গণিত ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজনসহ বিভিন্ন গাণিতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ক যাবতীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে।

গণিতের পাশাপাশি ক্লাবটি সুডোকু, রুবিক্স কিউব মিলানো (স্পিডকিউবিং) সহ নানা ধরনের গণিতভিত্তিক ব্রেইন গেমসে শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ করে তুলতেও কাজ করে যাচ্ছে।

কার্যক্রম ঃ

* রেমিয়ানদের জন্য দশটি গণিত ওয়ার্কশপের (অফলাইন ও অনলাইন) আয়োজন করা হয়েছে।

* স্পিড কিউবিং ওয়ার্কশপ (অফলাইন) আয়োজিত হয়েছে।

* দেশজুড়ে ১৪ দিনব্যাপী ম্যাথম্যাটিকাল ই-টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছে।

* সবার জন্য উন্মুক্ত ই-ম্যাথ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়।

* বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ২০২০ এর প্রস্তুতি হিসেবে ক্লাব ফেসবুক পেইজ থেকে প্রস্তুতিমূলক গণিত সেশন এর আয়োজন করা হয়।

* ক্লাব ফেসবুক পেইজ থেকে আন্তর্জাতিক পদকজয়ীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

* সাপ্তাহিক অনলাইন প্রব্লেম সলভিং অনুষ্ঠিত হয়।

* করোনা মহামারীতে গণিত চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য অনলাইন গাণিতিক আর্টিকেল ও ফান ফ্যাক্টস প্রকাশ করা হয়।

* স্পিড কিউবিং ও সুডোকু বিষয়ক অনলাইন গাইডলাইন প্রকাশিত হয়।

* রেমিয়ানদের জন্য আন্তঃপ্রতিষ্ঠান অনলাইন ম্যাথ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে।

* রেমিয়ানদের মধ্যে গণিতের ভালোবাসা ও শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ফেস্টের আয়োজন করা হয়েছে।

* ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্বে সফল রেমিয়ানদের জন্য অলিম্পিয়াডের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তিনটি অনলাইন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

* রেমিয়ানদের গণিত বিষয়ক সার্বিক সহায়তা ও তাদের গণিত এর প্রতি ভীতি দূর করতে অনলাইন প্লাটফর্মে দলগত আলোচনা করা হয় এবং হ্যান্ড নোট, ওয়ার্কশপ ও গাইড লাইন প্রদান করা হয়।

অর্জন :

* বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ২০২০ এর আঞ্চলিক পর্বে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ থেকে প্রায় ২০০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়।

* ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গণিত টিম 'Scholastica International Math Summit 2020' এ সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে **চ্যাম্পিয়ন** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

স্টুডেন্টস গ্যালারি

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্টুডেন্টস গ্যালারি

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

সন্দীপন-২০২১ এর প্রচ্ছদ অলংকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম

জাওয়াদ মুহাম্মদ নাহিন

কলেজ নং : ১৪০১০

শ্রেণি : দশম, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

দ্বিতীয়

তওসিফ ইমরান

কলেজ নং : ১৫১০১৩৮

শ্রেণি : দশম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

তৃতীয়

মোঃ ওয়াসিক আমান

কলেজ নং : ১৭০৮০

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ঙ (প্রভাতি)

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ-জ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঙ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (প্রভাতি)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (দিবা)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্মৃতির পাতায়

বর্ণিল ২০২১

হাউস বাগানে বিভিন্ন ফুলের সমারোহ

ফুলে ফুলে সজ্জিত হাউস বাগান

বিচিত্র ফুলের সমারোহে পুষ্প কানন

হাউস বাগানে ফুটন্ত ফুলের বৈচিত্র্য

পরিবেশ বিষয়ক অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান অধিকারী, মাননীয় অধ্যক্ষ স্যারের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহন করছে

পরিবেশ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকারী এই কলেজেন ছাত্রের পুরস্কার গ্রহণ

প্রকৃতি উৎসবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা পরিদর্শন

জাতীয় প্রকৃতি উৎসব-২০২১ এ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্য প্রদান

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজের নেচার এ্যান্ড আর্থ ক্লাবের মডারেটর মোঃ ফরহাদ হোসেন

বর্ণিল সাজে সজ্জিত হাউস বাগান

বাগান প্রতিযোগিতায় শহীদুল্লাহ হাউসের দৃশ্য

নব নির্মিত স্টাফ কোয়ার্টার কৃষ্ণচূড়া

সংস্কারের পর লালনশাহ হাউসের অবয়ব

কলেজ অভ্যন্তরে মায়াবী হরিণ

মনোমুগ্ধকর হাউসের ফুল বাগান

বিচিত্র ফুলে সজ্জিত হাউস বাগান

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

'জাতীয় প্রকৃতি উৎসব-২০২১' এ নেচার এন্ড আর্থ ক্লাবের মডারেটর মোঃ ফরহাদ হোসেন দলীয় কুইজে বিজয়ী ছাত্রদের পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

জাতীয় প্রকৃতি উৎসব-২০২১ এ রেমিয়ানস নেচার অ্যান্ড আর্থ ক্লাবের ছাত্রবৃন্দ

জাতীয় প্রকৃতি উৎসব-২০২১ উদ্বোধন করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

পুষ্পাক্ষরে লেখা হাউস বাগানের সৌন্দর্য

অপরূপ শৈল্পিক বিন্যাসে হাউস বাগান

পেট্রোমেক্স এলপিজি চতুর্থ ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেককার্নিভাল এর কর্মশালা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়

অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ

কলেজে শাপলা সিঞ্চন

বাংলাদেশের মানচিত্র

একাডেমিক ভবন-২

কলেজ বটতলা

প্রশাসনিক ভবন

কলেজ অডিটরিয়ামে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

ডিআরএমসি ইসলামিক কালচারাল ক্লাবের অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের উল্লাস

বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করছেন ইসলামিক কালচারাল ক্লাবের মডারেটর

ইসলামিক কালচারাল ক্লাবের সমাপনী অনুষ্ঠানের বিজয়ীরা

স্টাফ কোয়ার্টার ভবন কৃষ্ণচূড়া উদ্বোধনীতে মোনাজাত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠানে এই কলেজের চেয়্যারম্যান ও অধ্যক্ষ মহোদয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপন শেষে দোয়া ও মোনাজাত

অধ্যক্ষ মহোদয়

সিনিয়র উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন স্যারের বিদায় অনুষ্ঠান

হাউসে অধ্যক্ষ মহোদয়কে বরণ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ছাত্রদের শারীরিক সুস্থতা নিরুপণে তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ

১৫ আগষ্ট বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অধ্যক্ষ মহোদয়

সিনিয়র ভি.পি. ড. নুরুন্নবী স্যারের বিদায়ী সংবর্ধনা

অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক আইটি ফেস্ট পর্যবেক্ষণ

কলেজের শিক্ষক পরিবারের চড়ুইভাতি

জতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

"4th DRMC International Tech Expo-2021" আইটি ফেস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে আইটি ক্লাবের সভাপতি

"4th DRMC International Tech Expo-2021" আইটি ফেস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইটি ক্লাবের ক্লাব মডারেটর সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

আইটি ফেস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইটি ক্লাবের প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ নূরুন্নবী স্যার

আইটি ফেস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান

আইটি ফেস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

আইটি ফেস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক শিক্ষকদের ক্রেস্ট প্রদান

আর্ট ক্লাবের গ্যালারীতে ছাত্রদের আঁকা ছবি

আলোকচিত্র প্রদর্শনী কর্মশালায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অতিথিবৃন্দ এবং বিজয়ী ছাত্ররা

আলোকচিত্র প্রদর্শনী কর্মশালা পরিদর্শনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা-২০২১ বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা-২০২১ বিজয়ী ছাত্ররা

২০২১ সালে আমরা যাঁদের হারিয়েছি

আতাউল হক
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ

আমজাদ হোসেন
প্রাক্তন শিক্ষক

খগেন্দ্র নাথ সরকার
প্রাক্তন প্রভাষক

স্মৃতি অমলিন

শহিদ অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান

শহিদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান ছিলেন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি ১৯৬১ সালের ১৩ মার্চ থেকে ১৯৬৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলেজটির প্রতিটি স্থাপনা নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে কলেজের শিক্ষাভবন ও হাউসগুলো অবয়ব পেতে শুরু করে। তিনি ছিলেন একজন মহান শিক্ষক এবং তাঁর প্রগতিশীল প্রশাসনিক দক্ষতায় কলেজ গুণগত উৎকর্ষ লাভ করে। তিনি ছিলেন অমায়িক ও অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। এমনকি যখন তিনি ভীষণ জ্বরে অসুস্থ থাকতেন তখনও তাঁকে শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে কিংবা ছেলেদের সকালের নাস্তা, দুপুর বা রাতের খাবারের সময় হাউসে পাওয়া যেত। তিনি প্রায়ই নিজে ছাত্রদের খাবার খেয়ে স্বাদ ও গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করতেন এবং মধ্যরাতে হাউসে গিয়ে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাতে পারলো কি না সে খোঁজখবরও নিতেন। স্নেহের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সম্মান ও গৌরবের প্রতীক।

পরবর্তী সময়ে তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী কলেজের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁকেসহ একজন শিক্ষক ও একজন বাবুর্চিকে বাংলোর নিচে নিয়ে যায়। সেখানে শিক্ষককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাত করতে থাকলে অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করেন এবং কষ্ট দিয়ে না মেরে একবারে গুলি করে মেরে ফেলার অনুরোধ জানান। পরে তারা অধ্যক্ষ মনজুরুর রহমানকেও গুলি করে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে শহিদ অধ্যক্ষের নামে কলেজের প্রথম হাউস 'জিন্নাহ হাউসের' নাম বদলে রাখা হয় 'শহিদ লে. কর্নেল রহমান হাউস'। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর হাউসটির নাম '১নং হাউস' রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে '১নং হাউসের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কুদরত-ই-খুদা হাউস'।

শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ

শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই স্কুল থেকে ১৯৬৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং তাঁর স্কুল নম্বর-১৩৮। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১১ নভেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি পালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে প্রতিরোধব্যূহ তৈরি করে সহযোদ্ধাদের নিরাপদে পশ্চাদপসরণের সুযোগ করে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং আহতাবস্থায় শত্রুবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে বহু অনুসন্ধানের পরও তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে এই শহিদের নামে কলেজের 'আইয়ুব হাউসের' নাম বদলে 'শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ হাউস' রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর হাউসটির নাম '২নং হাউস' রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ সালে '২নং হাউসের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।